বড়মামার কীর্তি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

Baramamar Kirti

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৭১ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীসুধীর মৈত্র
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

বড়মামার কীর্তি

এক

বড়মামা খেতে খেতে বললেন, 'আমি একটা গাধা।'

মেজমামার বাঁ হাতে একটা বই ডান হাতে ঝোলে ডোবান রুটির টুকরো। এইটাই তাঁর অভ্যাস। সামান্য সময়ও নষ্ট করা চলবে না। অগাধ জ্ঞান সমুদ্র, আয়ু অল্প, বহু বিঘ্ন। সব সময় পড়ে যাও। সকালের কাগজ বাথরুমে বসে বসেই পড়েন। এখন যে বইটা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে পড়ছেন, সেটা কাক সম্বন্ধে। কাকের স্বভাব, কাকের সমাজ, কাকের নিয়মনিষ্ঠা। পড়তে পড়তেই বললেন।

'কি করে বুঝলে? তোমার কান দুটো অবশ্য একটু বড়ই ঝোলা ঝোলা, সাধারণ মানুষের কান অত বড় না? প্রকৃতির ব্যাপার? বোঝা শক্ত। কে যে কি ভাবে জন্মায়। চীনে মেয়েদের শিং বেরোচ্ছে। কলকাতায় ছেলেদের ন্যাজ বেরোচ্ছে।'

রুটির টুকরোটা মুখে ঢোকালেন। কোলের ওপর এক ফোঁটা ঝোল পড়ল। আগেও দু এক ফোঁটা পড়েছে। দৃকপাত নেই। জ্ঞান তপস্বী।

বড় মামা বললেন। 'স্কুলে অনেকবার আমাকে গাধা প্রমান করার চেষ্টা হয়েছিল। মানতে রাজী হইনি। তখন বোকা ছিলুম, গাধা ছিলুম না। এখন বোকাগাধা। ও সব কানটান নয়, এ আমার স্বীকারোক্তি। আত্ম সমীক্ষার ফল।'

মেজমামা বই থেকে চোখ না তুলেই বললেন, 'আমি দর্শনের ছাত্র, তর্কশাস্ত্র পড়েছি, অত সহজে মানতে পারব না। তুমি প্রমান কর: ডেকে দেখাও। গাধা চেনা যায় ডাক দেখে।'

'আমি চিনেছি গরু দেখে।'

'গরু দেখে গাধা চেনা। অবশ্য দুটো জন্তুরই চারটে পা। চতুষ্পদ। তা হলেও মুখে মেলে না স্বভাবেও মেলে না। তোমার

সিদ্ধান্ত ধোপে টেঁকল না। ধোপে টেঁকলে তুমি এতক্ষণ এই খাবার টেবিলে না থেকে ধোপার আস্তাবলে বাঁধা থাকতে। খাচ্ছ খেয়ে যাও। তর্কে এসনা হেরে যাবে।'

বড় মামা মাংসর হাড় চুষতে চুষতে বললেন, 'তুই একটা গাধা। দার্শনিক গাধা।'

মেজ মামা বইটা কোলের ওপর উপুড় করে রেখে বললেন, 'তুমি একটা ডাক্তার গাধা।' মাসীমা ফ্রিজ থেকে পুডিং বের করতে করতে বললেন, হ্যাঁ, এইবার গাধাগাধা করতে করতে হাতাহাতি হোক। খাওয়া মাথায় উঠুক।'

বড়মামা বললেন, 'তুই দেখ কুসী, কি রকম আনসিভিলাইজড। আমি যখন বলছি, আমি গাধা, তখন নিশ্চয়ই কারণ আছে। সেটুকু মেনে নেবার উদারতা পর্যন্ত নেই। উনি দার্শনিক। ঘোড়ার ডিমের দার্শনিক।'

মাসীমা টেবিলে পুডিং এর ডিশ সাজাতে সাজাতে বললেন, 'মেজদা, তোমারও ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব। তোমার এই সামান্য কথাটা মানতে কি হয়? মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?'

'কি করে মানব তুই বল কুসী। আমার তো স্মৃতিশক্তি এখনও তেমন দুর্বল হয়ে যায়নি। এই তিন দিন আগে, এই টেবিলে বসেই উনি বললেন, আমি গাধা। লজিক কি বলে? গাধাই ভগবান, ভগবানই গাধা। আমি ভগবান না মানলেও হিন্দুর ছেলে। আমার একটা সংস্কার আছে। গর্দভকে আমি ভগবান বলতে পারব না।'

মাসীমা খুব রেগে গেলেন। 'ওই লজিকেই তোমাকে মেরেছে মেজদা, যেমন ডাক্তারি মেরেছে বড়দাকে। দুজনকেই আর বিয়ে করতে হল না।

বড়মামা বললেন, 'একেই বলে মেয়েছেলে! গাধা থেকে বিয়েতে চলে গেলি?'

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে বড়মামার সঙ্গে একমত হয়ে গেলেন, 'ঠিক বলেছ বড়দা, ওটা একটা রিয়েল গাধা।'

মাসীমা বললেন, 'হ্যাঁ রিয়েল গাধা না হলে তোমাদের ভার বহন

করবে কে? সকালে কাপের পর কাপ চা, কারুর নরম টোস্ট, কারুর কড়া, কারুর ডিমের ওমলেট, কারুর পোচ, জল গরম, ত্রিফলা, পাঁচন, ইসবগুল, কারুর স্টু। যত রকমের ফ্যাচাং, কে সহ্য করবে। হাড়ে দুব্বো গজিয়ে গেল। কে গাধা, কে গাধা নয়, এ তর্ক এখন থাক। দয়া করে খাওয়া সেরে উঠে পড়। অনেক রাত হল। পাড়া নিশুতি হয়ে এসেছে।'

মেজমামা বললেন, 'আমি এখুনি উঠে পড়ছি, যারা ভগবানকে গাধা বলে, গাধাকে ভগবান, তাদের আমি ঘৃণা করি। আই হেট দেম।'

বড়মামা চামচে দিয়ে পুডিং এর মাথা থেকে লাল চেরিটা খসিয়ে নিয়ে বললেন, 'একে বলে গায়ে পড়ে ঝগড়া। অবশ্য ছেলে ঠেঙিয়ে প্রফেসারদের স্বভাবটাই মিনমিনে হয়ে যায়। পাঁচিলের ওপর হুলো বেড়ালের মত। মিঁআও মিঁআও। চলাও চলাও, ঝগড়া করি চাঁদের আলোয়।'

মেজমামা তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। কোলের বইটা পায়ের কাছে পড়ে গেল। মাসীমা মেজমামার হাতটা চেপে ধরলেন, 'কি ছেলেমানুষী হচ্ছে মেজদা?'

'ছেলেমানুষী। আমাকে হুলো বলবে, আমি বসে বসে সহ্য করব। ডাক্তারদের মানুষমারার লাইসেন্স আছে জানি, যা তা বলার পারমিট আছে কি?'

'মেজদা, তুমি দয়া করে বড়দাকে গাধা বলে মেনে নিলেই তো লেঠা চুকে যায়। সেদিন ভগবান বলে মানতে পারলে, আর আজ গাধা বলে মেনে নিলে তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। যাঁহাঁ রাম তাঁহাঁ কৃষ্ণ।'

'সেদিনও মানিনি আজও মানবনা।'

বড়মামা খুব শান্ত গলায় বললেন, 'বোস, বোস। অশান্তি করিসনি! স্বভাবটা পাল্টা। পুডিংটা খেয়ে দেখ। কুসীটা দারুন বানিয়েছে। তোর ওই ভুঁড়ি আরও এক বেঘত বেড়ে যাবে।'

মেজমামা আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। আমি তো জানি, পুডিং মেজমামার ভীষণ প্রিয় জিনিস। রাগ করে ছেড়ে চলে গেলে

রাতে নানারকম দর্শনের বই পড়ায় মন বসবেনা। আমাকে একদিন বলেছিলেন, খাবনা ত খাবনা, খেতে বসে আধাখ্যাঁচড়া খাওয়া হলে মেজাজটা খিঁচড়ে যায়। জানবি মুড়ি আর ভুঁড়ি। কানেকটেড। দুটোর মধ্যে ভীষণ যোগ।

'বড়মামা বেশী আদর মাখান গলায় বললেন, এবার প্লেটটা কোলের কাছে লক্ষ্মীছেলের মত টেনে নাও। লজ্জা কোরোনা। জানই তো আর একবার সাধিলেই খাইব।'

মেজমামা আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, 'ইমপসিবল। ইনসালট। ব্রুট্যাল অ্যাসলট।'

মাসীমা বললেন, 'এবার থেকে তোমরা দুজনে এক সঙ্গে খেতে বসবেনা। নেভার।'

বড়মামা বললেন, 'তুই অত সহজে খেপে যাস কেন? তর্কে রেগে গেলেই হার। পরাজয়। বোস, বোস। অবশ্য এটাও তোর একটা টেকনিক। ওঠ বোস করে খিদে বাড়ান।'

মেজমামা বসতে গিয়েও আবার উঠে পড়লেন। বড়মামার পায়ের কাছে যেন একটা স্প্রিং আছে। এক একবার একটু করে চাপ দিচ্ছেন আর মেজমামা উঠে পড়ছেন।

মাসীমা খুব রেগেমেগে বললেন, 'কি হচ্ছে কি বড়দা? তোমার রসিকতা থামাবে, না আমরা উঠে যাব? মেজদা তুমি না দার্শনিক? কোনো কথায় কান না দিয়ে খেয়ে উঠে যেতে পারছ না?'

বড়মামা বললেন, 'শুরুতেই বলেছি, আমি একটা গাধা। গাধা না হলে প্রফেসারের সঙ্গে কেউ এক টেবিলে খেতে বসে?'

'আবার শুরু করলে। তখন থেকে গাধাগাধা করছ। আচ্ছা গাধায় পেয়েছে ত।' মেজমামা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বাঁ হাতটা একবার করে মুঠো করছেন আবার খুলছেন। চেয়ারে বসতে সম্মানে লাগছে। মাসীমা মেজমামাকেও এক ধমক লাগালেন,

'তোমার ছেলেমানুষী দেখলে রাগ ধরে মেজদা। জানই তো বড়দার পেছনে লাগা স্বভাব! তুমি যতই লাফাচ্ছ উনি ততই তোমাকে উসকে দিয়ে মজা পাচ্ছেন।'

মেজমামা মুখ গোঁজ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। চামচে দিয়ে

রাগমাগ করে ইয়া বড় এক খাবলা পুডিং তুলে মুখে পুরলেন।

বড়মামা বললেন, 'আমি গাধা, তার প্রমাণ আমার গরু। আমার মত গাধা না হলে কেউ ওরকম তিনটে গরু পোষেনা। তোরাই বল, ওই গরু তিনটে আজ পর্যন্ত ক'ছটাক দুধ দিয়েছে।'

মাসীমা যেন বেশ খুশিই হলেন, 'ঠিক বলেছ বড়দা। গরু দিয়েই প্রমাণ করা যায় তুমি একটা গাধা।'

মেজমামা সব সময় বাঁকা পথ ধরেন। প্রতিবাদ করার জন্যে মুখিয়ে আছেন। বড়মামা বলেন, প্রোটেসটান্ট। মেজমামার উচিত ছিল চুপ করে শুনে যাওয়া। তা আর হল কই। হঠাৎ বলে বসলেন, 'কেন? ওয়ানস আপন এ টাইম তোমার কালো গরুটা হঠাৎ দিন তিনেক দুধ দিয়ে ফেলেছিল। তুমি সেই দুধ দেখে কলতলায় রবারের জুতো পায়ে দিয়ে নাচতে নাচতে পিছলে পড়ে গিয়েছিলে। একদিন গরুর অনারে সত্যনারায়ণ পুজো হয়েছিল। তুমি বলেছিলে সিন্নি খেয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, দুধে এতই নাকি ফ্যাট। একদিন মেজারিং গ্লাসে করে প্রত্যেককে এক আউনস করে দুধ খাইয়েছিলে। সেই খাঁটি দুধ খেয়ে আমাদের সব পেট খারাপ হয়ে গেল। গরুর ভাষা নেই। প্রতিবাদ করতে জানেনা বলে যা খুশি তাই বলে যাবে?'

'হ্যাঁ দিয়েছিল ঠিকই। তারপর আর দিয়েছে কি?'

'কেন দেয় নি?'

'তোর মত একগুঁয়ে স্বভাব বলে দেয় নি। দিতে পারি তবু দোব না। কি করতে পার কর।' মেজমামা এবার সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন,

'আমি আর তোমার ভুঁসো কালো গরু এক শ্রেণীতে পড়ল। অসম্ভব আর সহ্য করা যায় না।' মেজমামা বিদ্যাসাগরী চটির ফটাস ফটাস শব্দ তুলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। খুব রেগে গেছেন। যাক বাবা পুডিংটা শেষ করে গেছেন।

মাসীমা বললেন, 'তোমার বড়দার ভীষণ পেছনে লাগা স্বভাব!'

বড়মামা হিহি করে হেসে বললেন, 'ফায়ার হয়ে গেছে। ভেতরে গড়ড়্ গড়ড়্ শব্দ হচ্ছে।'

'গরুর সঙ্গে তুলনা না করলেই পারতে।'

'গাধার ভাই গরুই হয়। আমাদের ভায় ভায় হচ্ছে তুই এর মধ্যে নাক গলাতে আসিসনি। থার্ড পার্সন, সিঙ্গুলার নাম্বার।'

'ও, আমি হলুম থার্ড পার্সন? ঠিক আছে।'

মাসীমাও রাগ করে উঠে গেলেন। বড়মামা আমাকে বললেন।'

'এদের আজ কি হয়েছে বলত। কথায় কথায় রেগে যাচ্ছে। সব কটা ব্লাডপ্রেসারের রুগী। আমার যেমন বরাত। গরু তিনটেরও প্রেসার। তোর জানা আছে গরুর প্রেসার কোন পায়ে মাপে? মানুষের প্রেসার মাপি বাঁ হাতে। গরুর তো চারটেই পা। হাতের বালাই নেই।'

বড়মামা ভীষণ ভেবে পড়লেন। ব্যাপারটা ডাক্তারির দিকে চলে গেল। আমি বললুম,

'বোধহয় নেজে মাপে।'

কথাটা পছন্দ হল না, 'ধুর্, নেজ আবার একটা জিনিস। দড়ির মতো ঝোলে। নেজে কিস্যু নেই। ওটা একটা আব্রু। ওই যেখান দিয়ে গোবর বেরোয় সেটাকে ঢেকে রাখে। নেজ নয় বুঝলি। দেখি, পশুচিকিৎসার বই ঘেঁটে দেখতে হবে।'

বড়মামা হঠাৎ চিৎকার শুরু করলেন, 'কুসী, কুসী।'

মাসীমা ঘরের বাইরে খুটুস খুটুস করছিলেন।

'কি হল? চেঁচাচ্ছ কেন।'

'বাঃ চেঁচাবনা। আর কিছু দিবি না।'

'আবার কি দোব? পুডিং-এর পর আর বাকি থাকে কি? দি এন্ড।'

'সে কি রে। ফ্রুটস ট্রুটস দিবি না।'

'না, দয়া করে উঠে পড়। টেবিলটা পরিষ্কার করে নিক।'

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর আমার চোখ ঘুমে জুড়ে আসে। ধপাস করে শুয়ে পড়তে পারলে আর কিছুই চাই না। আজও সেই তালেই ছিলুম। পরিষ্কার বিছানা। নরম মাথার বালিস, কোল বালিস। মৃদু পাখার বাতাস। জানালার বাইরে সাদা ফুলে ফুটফুটে কামিনী গাছ। থমথম করছে মিষ্টি গন্ধ। কোণের

দিকে বড়মামার আরাম কেদারার কাছে তে-ঠ্যাঙা বড় টেবিল ল্যাম্পের মাথার ওপর হালকা সবুজ রঙের শেড স্বপ্নের মত আলো ছড়িয়ে রেখেছে। ঘুম আয়, ঘুম আয় বলতে হয় না, ঘুম যেন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

বিছানায় পা দুটো তুলে সবে শুতে যাচ্ছি, বড়মামা, 'হাঁ হাঁ' করে উঠলেন,

'খেয়েই শোয়া কি? ভেরি ব্যাড হ্যাবিট। হজম হবে না, ডিসপেপসিয়া ধরবে। চাঁদ উঠেছে। চলো ছাদে যাই। ঘণ্টাখানেক পায়চারি করে, পেট কমিয়ে, এক গেলাস জল খেয়ে, জল বিয়োগ করে তারপর বিছানা। নট নাও, নট নাও। উঠে এসো।'

ব্যাস্ ঘুমের বারোটা বেজে গেল। বড়মামার যখন স্বাস্থ্যের দিকে আজ নজর পড়েছে তখন আর বিছানা না ছেড়ে উপায় নেই।

আজ অবশ্য ছাতটা বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। হু হু আকাশ। চাঁদের আলো যেন গানের মত ছড়িয়ে আছে। ছোট ছোট তারারা আজ আর ফোটেনি। বড় বড় গ্রহরা এখানে ওখানে পড়তে বসে আমার ঘুম-রাঙা চোখের মত ড্যাবড্যাব করছে।

ছাতের এ মাথা থেকে ওমাথায় যেতে যেতে বড়মামা বললেন,

'একটা ডেয়ারী হয়ে যেত।'

'সে আবার কি?'

'যত টাকা ওই বাঁদর গরু তিনটের পেছনে ঢেলেছি সেই টাকায় একটা ছোটখাটো ডেয়ারী হয়ে যেত।'

আজ বুঝি হিসেবে বসেছিলেন?

'হিসেব কি রে? এরপর নগেন আমার গলায় গামছা দেবে। হাজার টাকা পাওনা। গত পাঁচ মাসে বাবুরা হাজার টাকার খড় খেয়েছেন। এর উপর ভুসি আছে, ছোলারচুনি আছে, ভেলিগুড় আছে, গোষুধ আছে, দুটো লোকের মাইনে আছে।'

'গোষুধ কি বড়মামা।'

'গরুর ওষুধ?'

ছাতের ওমাথায় তুলসীগাছের টব ছুঁয়ে আমরা এ মাথার রজনীগন্ধার টবের কাছাকাছি এসে গেছি। বিশাল ছাত তিরিশ

পাকে এক মাইল তো হবেই।

'ইয়ারকি পেয়ে গেছে। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। 'দুর্জন গরুনাং তথা শূন্য গোয়ালং শ্রেয়ঃ' পঞ্চতন্ত্রে আছে। কুঁক করে হাসছিস কেন?'

'মানে সংস্কৃতটা কি রকম বায়োকেমিক, বায়োকেমিক লাগছে।'

'হ্যা-হ্যা, তুই আমার চেয়ে সংস্কৃত বেশি জানিস। ম্যাট্রিকে লেটার পাওয়া ছেলে আমি। ভাটপাড়ায় টোল না করে ডাক্তার হয়ে লাল জল, নীল জল করছি।'

সংস্কৃত নিয়ে বেশি খোঁচাখুঁচি করার সাহস হল না। হঠাৎ যদি জিগ্যেস করে বসেন, ঠিকটা কি হবে তুই তা হলে বল। সংস্কৃত ছেড়ে গরুর দিকেই থাকা ভাল।

'আপনি গরুগুলোকে তা হলে কি করবেন? ছেড়ে দেবেন।'

'ছেড়ে দোবনা, তবে গরুগরু করে গাধার মত আর নাচানাচি করবনা। দুধের আশায়ও থাকবনা। তোমরা থাক তোমাদের গোয়ালে আমি থাকি আমার ঘরে। দুধ দিতে হয় দেবে, না দিতে হয় না দেবে। পয়সা থাকে কিনে খাব, না থাকে চা খাব। আমি কি তরাই প্রভু ভিখারি গারবে।'

বাবা! আজ একবারে সংস্কৃতের ফোয়ারা ছুটছে। পটাস পটাস করতে করতে আবার তুলসী-গাছের টবের কাছে এসে পড়েছি। এবার তো শুয়ে পড়লেই হয়।

'বড়মামা সব তো হজম হয়ে গেল এবার একটু বিশ্রাম করলে হয় না?'

'খেপেছিস। এর মধ্যে শুবি কি-রে। একটা ফিউচার প্ল্যান তৈরি করতে হবে না।'

'কিসের প্ল্যান?'

'গরু ছেড়ে দিলুম। আর একটা কিছু ধরতে হবে তো।'

'কেন? কুকুর রয়েছে গোটাছয়েক, পাখি রয়েছে খাঁচায় খাঁচায়, দুটো বেরাল।'

'ধ্যার। ওদের কি ধরব? বড় একটা কিছু ধরতে হবে। মহান, মহৎ, অসীম, অনন্ত।'

'সে আবার কি ?'

'আমি একটা লঙ্গরখানা খুলব।'

'লঙ্গরখানা ?'

'কিছুই জানিস না ? রোজ হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি তৈরি করে দুপুর বেলা দরিদ্র মানুষদের খাওয়াব। রাজা রাজেন মল্লিকের মত। দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে ফ্রী চিকিৎসা চালাব ? একটু একটু করে আমার এই সমাজসেবা এমন চেহারা নেবে হেঁ হেঁ ?'

'হেঁ হেঁ মানে ?'

'হেঁ হেঁ মানে মাদার টেরেসা ! তোর মেজোকে বলে আয় মনের জোর ইচ্ছাশক্তি, তেজ আর ত্যাগ থাকলে নোবেল পুরস্কার পাওয়াটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। শুধু পুডিং খেলেই হয় না, পুডিং খাওয়াতে হয়। আমি আমি করলে নিজের ভুঁড়িটাই বাড়ে ? তুমি তুমি করলে আমিটা পেল্লায় বড় হয়ে বিশ্ব আমি হয়। বিশ্বামি ভবেৎ।'

'বিশ্বামি' ?

'হ্যাঁ স্বরসন্ধি। অকারের পর আকার থাকিলে উভয় মিলিয়া দীর্ঘাকার হয় ? এখুনি জিগ্যেস করবি দীর্ঘাকার কি ? দীর্ঘ প্লাস আকার। এও স্বরসন্ধি ?'

'মেজমামাকে এখুনি বলে আসব ?'

'শিঅর ? নাকের ডগায় রাসেল নিয়ে বসে আছে বার্ট্রান্ড বানান জানে না।'

যাক বাবা ? বড়মামার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া গেছে। মেজমামার ঘরে গিয়ে ঘুম লাগাই।

সকালবেলা বড়মামাকে ঘরে পেলুমনা। অথচ এই সময়ে ঘরে থাকারই কথা। লাল টকটকে সিল্কের লুঙ্গি। খোলা গা। পিঠের ওপর ইয়া মোটা সাদা পইতে। তাতে আবার একটা আঙটি বাঁধা। হাতের আঙুলে জায়গা নেই। আঙটি কোমরের কাছে ঝুলছে। চেয়ারে বাবু হয়ে বসা। ছটা কুকুর ঘর ময় হ্যা হ্যা করছে। এক একটা পালা করে লাফিয়ে উঠে বড়মামার হাত থেকে বিসকুট ছিনিয়ে নিচ্ছে। মনে মনে হিসেব করে এক একটা

বদমাইশকে ধরে ফেলছেন, উঁহুঁ উঁহুঁ তোর দুটো হয়ে গেছে এইবার ওইটার পালা।' কে কার কথা শোনে সবকটাই ঘাড়ে ঘাড়ে লাফাচ্ছে। মাঝেমাঝে পইতেতে পা আটকে যাচ্ছে। বড়মামা ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলছেন 'এইবার সবকটাকে দূর করে দেব। ইনডিসিপ্লিন্‌ড জানোয়ার।' বলেই পইতের ঝোলা অংশ তুলে ঝপ লে ঠেক চ্ছেন।

কোথায় সেই পরিচিত দৃশ্য! ঘরময় কুকুরের ছড়াছড়ি। প্রভু বেপাত্তা।

দক্ষিণের জানালায় উঁকি মেরে দেখি বড়মামা বাগানের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের চেহারায় ভীষণ ভাবনা। কি হল কে জানে? হঠাৎ চোখাচোখি হতেই ইশারায় ডাকলেন। বাগানে নামতেই আমাকে বললেন,

'বুঝলি, এইখানেই হবে।'

'কি হবে বড়মামা? নারকোল গাছ?'

'আরে না রে না। তোর কেবল খাবার চিন্তা?'

'তবে?'

'এইখানে হবে সেই লঙ্গরখানা। একপাশে বিশাল উনুন। আর একপাশে সারি সারি টেবিল আর ফোলডিং চেয়ার। ওই কোণে কল আর জল। এইখানটায় একটা পেটা ঘড়ি। ঢ্যাং করে যেই একটা বাজবে, খাওয়া স্টার্ট। দুটোর মধ্যে যারা যাবা আসবে তারাই খেতে পাবে। একটা থেকে দুটো। কড়া নিয়ম।'

'টেবিল, চেয়ার?'

'তবে না ত কি? দরিদ্র নারায়ণ সেবা। ভেজিটেবল খিচুড়ি আর যে কোনও একটা ভাজা। সপ্তাহে একদিন চাটনি। চল এইবার চট করে হিসেবটা করে ফেলি।'

বড়মামা ঘরে ঢুকতেই কুকুরগুলো মুখিয়েছিল, সকালের বিস্কুট পায়নি। চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরল। একটা পায়ের কাছে। একটা পেছনের দিকে পিঠের ওপর দুটো পা রেখে দাঁড়িয়ে উঠেছে। একটা সামনের দিকে ক্রমান্বয়ে লাফাচ্ছে। বড়মামা বললেন,

'উঃ! পাওনাদারদের জ্বালায় জীবন গেল।'

বিস্কুট পর্ব শেষ হতে না হতেই মাসীমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সব কটা কুকুরকে একজায়গায় দেখে বললেন, 'পয়সার কি জ্বালা! কত মানুষ না খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে আর কারুর আধডজন কুকুর রোজ এক কেজি হরলিকস বিস্কুট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করছে। উৎপাতের ধন এইভাবেই চিৎপাতে যায়!'

'ঠিক বলেছিস কুসী।'

বড়মামার সমর্থন শুনে মাসীমা ভীষণ অবাক হলেন,

'অ্যাঁ ভুতের মুখে রামনাম।'

বড়মামা চায় চুমুক দিয়ে বললেন, 'একেবারে অন্য রাস্তায় যাত্রা। কমপ্লিট বিবেকানন্দ। জীবে দয়া করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর! প্রথমে পঁচিশজন দিয়ে শুরু, ধীরে ধীরে একশো, দুশো, তিনশো, পাঁচশো, হাজার।'

মাসীমা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'হাজার কুকুর। অত কুকুর পাবে কোথায়?'

'গবেট! কুকুর নয়, কুকুর নয়, মানুষ। দরিদ্র নারায়ণ সেবা।'

'সে আবার কি? বারোয়ারী পুজো প্যান্ডেলে ফি বছর একদিন নারায়ন সেবা হয়। তুমি তার প্রেসিডেন্ট হলে নাকি?'

'আজ্ঞে না স্যার। এ হবে সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের ফ্রী কিচেন, জাস্ট লাইক রাজা রাজেন মল্লিক অফ মার্বেল প্যালেস। আজই নগেনকে ডেকে বাগানে একটা আটচালা তৈরীর হুকুম দিচ্ছি। কালই খগেন এসে উনুন করে দেবে। পরশু আসবে চাল, ডাল, আলু, নুন, তেল, মশলা, তেজপাতা, তরশু বেলা একটা। দেখবি সে কি কাণ্ড? গরমাগরম খিচুড়ি খেয়ে লোক দু হাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে চলেছে—লং লিভ রাজা, সরি, ডাক্তার সুধাংশু মুকুজ্যে!'

'সর্বনাশ!'

'সর্বনাশ কি রে! বিবেকানন্দ বলে গেছেন, জন্মেছিস যখন দেয়ালের গায়ে একটা আঁচড় রেখে যা। তুই হবি এই নারায়ণ যজ্ঞের সুপারভাইজার। এক সেকেন্ড বস তো। তোর পরামর্শে

হিসেবটা সেরে নি। ধর পঁচিশ জন।'

মাসীমা ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

'তুমি দেউলে হয়ে যাবে বড়দা? তুমি নিজে মরবে আমাদেরও মারবে।'

'আমি মরি মরব। জনমিলে মরিতে হবে। তোরা মরবি কেন বালাই ষাট। নে বল, পঁচিশজনে ডেলি কত চাল খেতে পারে? পেট ভরে খাবে, হাফভরা নয়, ফুলভরা।' মাসীমা বললেন, 'পঁচিশ কেজি।'

বড়মামা অবাক হয়ে বললেন, 'নার্ভাস করে দিচ্ছিস। বল, পঁচিশ পো, মিনস ওই ছসের। মিনস ব্ল্যাকে কিনলে আঠার টাকা। এইবার ডাল। ছ সের চালে কত ডাল লাগে রে?'

'ফর্মুলাটা কি?'

'চালের ডবল ডাল।'

'ভাগ্ ভাঙচি দিচ্ছিস, হাফ ডাল হাফ মিনস তিন কেজি, পনের টাকা। আঠার প্লাস পনের ইজিকলটু তেত্রিশ। ইত্যাদি আরও সাত মানে চল্লিশ। কয়লা, রান্না ইত্যাদি দশ। রোজ পঞ্চাশ টাকা, নাথিং, নাথিং। চল ভাগনে লেগে পড়ি।'

বড়মামার সে কি উৎসাহ। তড়াং করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। মাসীমা বললেন,

'ভাগনে কি ভাবে লেগে পড়বে?'

'যে ভাবে লাগাব সেই ভাবে লাগবে। ওর মত ছেলে লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ।'

'সে ত বুঝলুম; কিন্তু তোমার এই রাজসূয় যজ্ঞে ও কি ঘোড়া ধরতে বেরোবে।'

'আমাদের এখন কত কাজ জানিস। আটচালা তৈরি রাঁধবার লোক ঠিক করা। উনুন বসান। চাল ডাল কেনা। তারপর প্রচার।'

'প্রচার মানে?'

'প্রচার মানে?' বড়মামা রেগে গেলেন। প্রচার মানে প্রচার। লোকে জানবে কি করে? না জানতে পারলে লোক আসবে

কি করে।'

'অ। তা সেটা কি ভাবে হবে। কাগজে বিজ্ঞাপন, বিবিধ ভারতী, দেয়ালে পোস্টার, মাইক নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা, সিনেমায় স্লাইড।' কোনটা।

'ভ্যাক্। ওর কোনটাতেই কাজ হবে না। দুস্থ মানুষ যারা পড়তে জানেনা, যাদের পয়সা নেই, সিনেমা দেখে না, তাদের অন্যভাবে জানাতে হবে। ভোটার লিস্ট তৈরির মত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে প্রকৃত গরিব মানুষ খুঁজে বের করে হাত জোড় করে সবিনয়ে বৈষ্ণবদের মত বলতে হবে, দয়া করে এই অধমের গরীব খানায় প্রসাদ গ্রহণ করবেন।' মাসীমা বললেন, 'ডাক্তারি তা হলে মাথায় উঠল!'

'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধেনা, ইডিয়েট। যা আর এক কাপ চা করে আন। বেরিয়ে পড়ি। তোদের মত আলস্য যোগে জীবন ম্যাসাকার হতে দোবনা। কর্মযোগ, কর্মযোগ। যোগ কর্মসু কৌশলম্। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন। গীতা পড়েছিস গবেট।' মাসীমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বড়মামা প্যান্ট জামা পরে তৈরি হবার জন্যে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হলেন।

মাসীমা ঠক করে চায়ের কাপ টেবিলে রাখলেন। বড়মামা চমকে মুখ তুলে তাকালেন। কাগজে দক্ষিণ পাড়ার ম্যাপ আঁকছিলেন। যে যে রাস্তা ধরে আমরা যাব তারই পরিকল্পনা। 'খুব রেগে গেছিস মনে হচ্ছে।'

'রাগলে তোমার আর কি? তুমি কার পরোয়া কর? তবে তোমার এই সব ব্যাপার মেজদা জানে?'

'হু ইজ মেজদা! তার দর্শনে জীবে দয়া নেই জিভে দয়া আছে। ভগবান একটা না দুটো, না শূন্য, ভগবান আমি না আমিই ভগবান, তিনি সাকার না নিরাকার, এই গোলকধাঁধাতেই বেচারা সারা জীবন বোকার মত ঘুরতে ঘুরতে ম্যাড হয়ে গেল। তুই যা, তুই যা আমাদের এখন অনেক কাজ। মেয়েদের সঙ্গে বকবক করার সময় নেই।'

মাসীমা বেশ বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। আমি বললুম,

'বড়মামা, হাওয়া খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'রাখ রাখ, ঝোড়ো হাওয়াতেই আমাদের নিশান উড়বে পত পত করে।'

মটরসাইকেলে উঠতে উঠতে বড়মামা বললেন, 'প্রথমে একবার চক্কর মেরে যাই। তুই শুধু চোখ-কান সজাগ রেখে দেখে যাবি। যেই মনে হবে এই লোক সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে আমার পিঠে খোঁচা। গাড়ি থামিয়ে তাকে যা বলার আমি বলব।'

বড়মামার মটর সাইকেল তার যেমন রঙ তেমন আওয়াজ। কানে তালা লেগে যাবার মত অবস্থা। শক্ত করে ধরে বসে আছি। পকেটে সেই ম্যাপ। বীরেন শাসমল রোড দিয়ে ঢুকে, রাম চ্যাং রোডে পড়ে, শরৎচন্দ্র স্ট্রীট হয়ে, কালু শেখ রোড ধরে বিরাট একটা চক্কর মারা হবে। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই বড়মামার অন্নসত্রে আসতে পারবে। বড় বড় হরফে দরমার গায় লেখা থাকবে, 'শক, হুন, দল, মোগল পাঠান এক দেহে হল লীন।'

সবে সকাল হয়েছে। রাস্তায় বেশ লোক চলাচল। সকলেই যে যার কাজে চলেছেন। কেউ বাজারে। কেউ স্কুলে ছেলে মেয়ে পেঁছিতে। কেউ অফিসে। চারপাশের দোকানপাট খুলে গেছে। জমজমাট ব্যাপার। সাইকেলের সামনে কাগজ ডাঁই করে হকার চলেছেন বাড়ি বাড়ি কাগজ দিতে। চোখে এমন একজনও পড়ছে না যাকে মনে ধরে। বড়মামা বলে দিয়েছিলেন, দেখবি মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, জটপাকান চুল, তোবড়ান গাল, গর্তে বসা চোখ, শির বের করা হাত, সামনে কুঁজো হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে, কিম্বা উদাস হয়ে রকে কি গাছতলায় বসে আছে, বিড় বিড় করে আপন মনে বকছে, দেখলেই বুঝবি এই সেই লোক, দি ম্যান।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর বড়মামা একটা বটগাছ তলায় গাড়ি থামিয়ে বললেন,

'দেশের কি রকম উন্নতি হয়েছে দেখছিস! গরিবী হাটাও ত সত্যিই গরিব হাটাও সবাই ওয়েল-টু-ডু ম্যান। একটা লোকও চোখে পড়ল না!'

'বুধবার তা হলে পাল পাল ভিখিরি আসে কোথা থেকে?'

'আরে দূর। বুধবার এ তল্লাটের মিল ফিল বন্ধ থাকে, পালে পালে সব বেরিয়ে পড়ে উপরি রোজগারের ধান্দায়। ওরা কেউ রিয়েল ভিখিরি নয়।'

'আমার কি মনে হয় জানেন?'

'কি?'

'আমরা যাদের খুঁজছি তারা কেউ উঠে-হেঁটে আর বেড়াতে পারছে না। কোথাও না কোথাও ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছে।'

'হতে পারে। কিন্তু কোথায় শুয়ে আছে?'

'মনে হয় গঙ্গার ঘাটে, মোচ্ছব তলায়, শ্মশানে পাকুড়তলায় বাঁধান চাতালে।'

বড়মামা খুব তারিফ করলেন, 'মন্দ বলিস নি। উঠতেই যদি পারবে তাহলে ত খেটে খাবে। না খেতে পেয়ে সব লটকে পড়ে আছে। ঠিক বলেছিস। বড় হয়ে তুই ব্যারিস্টার হবি। চল, তা হলে মোচ্ছব তলাতেই আগে যাই।'

বড়মামা নেচে নেচে মটর সাইকেল স্টার্ট করলেন। ভু, ভট্-ভট্ শব্দে আকাশ ফেটে গেল। গাছের ডালপালা থেকে পাখি উড়ে পালাল ভয়ে। গঙ্গার দিকে রাস্তাটা যতই এগোচ্ছে ততই ঢালু হচ্ছে। ইটের গোলা, বাঁশের গোলা। খড়কাটা কল চলছে ঘস্-ঘস্ করে।

মোচ্ছব তলাতেই আমাদের প্রথম বউনি হল। একটি লোক উদাস মুখে বসে আছে। যেন জীবনের সব কাজ শেষ। হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। মুখে অল্প অল্প কাঁচাপাকা দাড়ি। কোটরে বসা ঘোলাটে চোখ। শীর্ণ-শীর্ণ হাত পা। ভাঙা গাল। বকের মত গলা।

'বড়মামা-আ!'

'দেখেছি।'

'সব মিলছে। তবে নাকে তিলক-সেবা করেছে।'

'তা করুক। বৈষ্ণব, বুঝেছিস!' বড়মামা গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে নেমে পড়লেন। এইবার কথাটা পাড়বেন। লোকটির কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কে তো কে। জগতে কোনও কিছুর পরোয়া করে

না। এই রকম একটা ভাব। বড়মামা প্রথমে গঙ্গাদর্শন করলেন। তারপর মোচ্ছব তলায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। এইবার কি করেন দেখি।

লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নমস্কার হই।'

লোকটি বললে, 'জয় নেতাই।'

বড়মামা বললেন, 'জয় নিতাই।'

লোকটি বললে, 'দেশলাই আছে?'

'দেশলাই ত নেই।'

'সিগারেট আছে?'

'সিগারেট ত খাই না।' বড়মামা যেন খুব লজ্জা পেলেন।

'জয় নেতাই। পঞ্চাশটা পয়সা হবে?'

বড়মামার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল আশার আলো ফুটেছে। এতক্ষণে লোকটি এমন একটা জিনিস চেয়েছে যা বড়মামার কাছে আছে। পকেট থেকে একটা গোল টাকা বের করে লোকটির হাতে হাসি হাসি মুখে দিলেন।

'জয় নেতাই। পঞ্চাশটা পয়সা আবার ফেরত দিতে হবে না কি?'

'না না, পুরোটাই আপনার। এইবার একটা কথা বলব?'

'কি কথা? কেউ মরেচে নাকি?'

বড়মামা চমকে উঠলেন, 'কেউ মরবে কেন?'

'আমার সঙ্গে লোকের কথা মানেই ত কেউ মরেচে,—দুখী বোস্টুম চল হে কেত্তন গাইতে হবে।'

'নানা ওসব নয়, ওসব নয়, অন্য কথা। আপনি খেতে পারবেন!'

'খেতে? কি খেতে? শ্রাদ্ধ?'

'নানা শ্রাদ্ধট্রাদ্ধ নয়। এমনি খাওয়া। রোজের খাওয়া। ভোগ আর কি!'

'কোন্ আশ্রম? আমি চরণদাস বাবাজীর চেলা। অন্য ঘরে নাম লেখাতে পারবনা। ধম্মে সইবে না।'

'আশ্রম নয়। আমার বাড়িতে।'

'কার পাচিত্তির ? কি অসুখ।'

'পাচিত্তির মানে ? ও বুঝেছি। প্রায়শ্চিত্ত। না না প্রায়শ্চিত্ত নয়। জাস্ট এমনি খাওয়া।'

'বদলে কি করে দিতে হবে ? বেড়া বাঁধা, ঘুঁটে দেওয়া, চেলা কাটা, খড় কাটা !'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, ও সব কিচ্ছু না। রোজ একটা নাগাদ যাবেন খাবেন-দাবেন, চলে আসবেন।'

'কি খাওয়া !'

'খিচুড়ি, ভাজাটাজা এই আর কি।'

'কি ডাল ? মুসুর ডাল চলবেনা। মুগ হওয়া চাই।'

'তাই হবে।'

'কি চাল ? আলো না সেদ্ধ ?'

'ধরুন সেদ্ধ।'

'হ্যাঁ সেদ্ধই ভাল। আলোতে পেট ছেড়ে দেবে। ও বেধবাদেরই চলে। রেশানের কাঁই বিচি চাল, না বাজারের চাল ?'

'বাজারের, খোলা বাজারের ভাল চাল।'

'ঘি পড়বে, না খসখসে খেসকুটে ? খিচুড়িতে ঘি না পড়লে টেস্ট হয় না !'

'হ্যাঁ তা পড়বে।'

'শালপাতায়, না কলাপাতায়, না চটা ওঠা এনামেলের থালায় ?'

'না না, ধরুন শালপাতায়।'

'হ্যাঁ, এনামেল হলে খাব না। তা শেষ পাতে একটু মিষ্টি না থাকলে জল খাব কি করে ? বোষ্টম মানুষ। একটু পায়েস হলেই ভাল হয়।'

'সপ্তাহে তিন দিন।'

'রোজ হলেই ভাল হয়। যাক মন্দের ভাল। হ্যাঁ একটা কথা বোস্টমীকে নিয়ে আমরা সাতটি প্রাণী। সপরিবারে না আমি একলা ?

বড়মামার মুখ দেখে মনে হল আকাশের চাঁদ পেয়ে গেছেন,

'সাত জন? বলেন কি? এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল। না না একা নয় একা নয়। সপরিবারে।'

'জয় নেতাই। তা হলে কবে থেকে?'

'আজ হল গিয়ে রোববার। সোম, মঙ্গল, বুধ। হ্যাঁ বুধবার থেকে। বুধ ভাল বার।'

'প্রভুর নিবাস?'

বাব্বা বড়মামা প্রভু হয়ে গেলেন। মেজমামা একবার শুনলে হয়, জ্বলে যাবেন। বড়মামা বাড়ির নির্দেশ দিতেই লোকটি বললে, 'অ আমাদের কেদারবাবুর বড় ছেলে। সেই ছিটেল ডাক্তার।' বড়মামার মুখটা কেমন হয়ে গেল,—'ছিটেল বললেন!'

'ছিটেল বলব না? সবাই জানে ডাক্তারটা খেয়ালী।'

'আমিই সেই ডাক্তার।'

'সে আগেই বুঝেচি। হক কথা বলব, ভয়টা কিসের! উকিল আর ডাক্তার শেষ জীবনে পারের কড়ি কুড়োতে চায় ধর্ম্মকর্ম্ম করে। সারা জীবনের অধর্ম্মের পয়সা। একজন মারে মক্কেল, আর একজন মারে রুগী। দেখেন না, আজকাল মন্দিরে আশ্রমে কত ভিড়! সব ওই ভেজালদার, কালোবাজারী, ডাক্তার, উকিল, এম. এল. এ, মন্ত্রী।'

ভট্-ভট্ করে মটরবাইকে আসতে আসতে বড়মামা বললেন, 'কি রকম ট্যাঁকট্যাঁকে কথা শুনেছিস! ওই জন্যে লোকের ভাল করতে নেই। নেহাত সেদিন বইয়ে পড়লুম, লিভ, লাভ অ্যান্ড লাফ, তা না হলে অ্যায়সা রাগ ধরছিল। যাক বরাতটা খুব ভাল। এই বাজারে সাত সাতটা লোক পাওয়া! বাকি রইল আঠারটা।'

'ভাববেন না বড়মামা। ঠিক যোগাড় হয়ে যাবে। একবার খবরটা ছড়াতে দিন।'

আরও টহল মারা হল। এবার আর চারে মাছ পড়ল না, যাক সাতটা পড়েছে। ভাল ক্যাচ। বড়মামার বৃদ্ধ কমপাউন্ডারের নাম সতুবাবু। সতুবাবুকে ভার দেওয়া হল আরও আঠারজন সংগ্রহ করার। 'পারবেন ত?'

'হ্যাঃ' সতুবাবু অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, 'আঠার কেন, আঠারশো ধরে এনে দিতে পারি।'

বেলা বারোটা নাগাদ লোক লস্কর নিয়ে বড়মামা নেপোলিয়ানের মত মার্চ করে বাড়ি ঢুকলেন। একজন বাগানের আগাছা পরিষ্কার করবে। একজন বাঁশ বাঁধবে। একজন উনুন পাতবে। একজন দরমা ঘিরবে। মাসীমা সেই পল্টন দেখে হাঁ হয়ে গেলেন। এখনি হুকুম হবে, 'চা দে কুসী, চাল নে, সব ভাত খাবে।' হই-হই ব্যাপার।

'হই-হই ব্যাপার।'

মেজমামা এক ফাঁকে খুব গম্ভীর মুখে আমাকে ডাকলেন।

'কি সব হচ্ছে হে! ভূতের নৃত্য!'

'খুব মজা মেজমামা। কত লোক আসবে। খাবে। দু'হাত তুলে যাবার সময় চিৎকার করে বলবে, জয় রাজা রাজেন মল্লিক।'

'রাজা রাজেন মল্লিক? তোমার বড় মামা কি নাম পালটে ফেললে না কি? নাম ভাঁড়িয়ে শেষে এই অসৎ কাজে নেমে পড়ল?'

'আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি। আসলে বলবে, জয় রাজা সুধাংশু মুকুজ্যে।'

'রাজা! কোথাকার রাজা? কামপুচিয়ার? ওই টাইম-টেবলটা আন ত।'

ড্রয়ারের ওপর থেকে টাইম-টেবলটা এনে মেজমামার হাতে দিলুম। একটা পাতা খুলে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম, রাত নটা চল্লিশ।'

'কোথায় যাবেন মেজমামা।'

'যেদিকে দুচোখ যায়।'

'সে কি?'

'হ্যাঁ তাই। পাগলামি অনেক সহ্য করেছি। আর নয়।'

'দরিদ্রসেবা পাগলামি? অসৎ কাজ?'

'পরে বুঝবে। এখন যেমন নাচ্ছ নেচে যাও। সবুরে মেওয়া ফলবে। তখন মেও সামলাতে পুলিস ডাকতে হবে।'

বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রফেসার কি বলছিল রে?'

'বলছিলেন, অসৎ কাজের ঠেলা পরে বুঝবে কামপুচিয়ার রাজা।'

'অসৎ কাজ!' বড়মামা হই-হই করে হেসে উঠলেন, 'হিংসে, বুঝলি, হিংসে। সারা জীবন ছেলে ঠেঙিয়ে কিছুই করতে পারলনা। আমি এক কথায় ফেমাস হয়ে গেলুম। এখন পরিচয় দিতে গেলে বলতে হবে, সুধাংশু মুকুজ্যের ভাই। কোন সুধাংশু? আরে সেই ডকটর সুধাংশু, গরিবের মা-বাপ।'

'মেজমামা ত রাত নটা চল্লিশের ট্রেনে যেদিকে দু'চোখ যায় সেই দিকে চলে যাচ্ছেন।'

'তাই না কি? হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। ভজা, ভজা।'

বড়মামার পার্শ্বচর ভজা। 'যাই বড়বাবু।'

'চাল?'

'আ গিয়া।'

'ডাল?'

'ও ভি আ গিয়া।'

'বহত আচ্ছা। চা বানাও।'

ভজা গান গাইতে গাইতে চলে গেল। গোয়ালে গরু তিনটে ফ্যালফ্যাল করে প্রায় খালি ডাবরের দিকে তাকিয়ে আছে। কালোটা হাম্বা করে উঠল। মানে, এবার দুধ দেবার চেষ্টা কর, নয়ত মালিক খুব খেপে গেছে। ন্যাজ মলে বিদায় করে দেবে।

মঙ্গলের ঊষা বুধে পা। সানাইটাই যা বাজল না। তা ছাড়া সবই হল। সকালে মন্ত্র পড়ে উনুন পুজো হল। বাঁশ থেকে ফুলের মালা ঝুলল ঝুলুর-ঝুলুর করে। কাগজের রঙীন শিকলি চলে গেল এপাশ থেকে ওপাশে। শ্যামজেঠা বেলতলায় বসে সকাল থেকে চণ্ডীপাঠ করলেন। বড়মামা মাসীমাকে ডেকে বললেন, 'কুসী, সকালে আমি আর তোদের বাড়িতে খাব না। সকলের সাথে ভাগ করে নিতে হবে অন্নপান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। আমি হর্ষবর্ধন। সঙ্গমে স্নান করে নিজের পরনের কাপড়টা পর্যন্ত দান করে দোব…।'

'তারপর নেংটি পরে কুয়োতলায় ধেই-ধেই করে নাচব।' মাসীমা রেগে চলে গেলেন।

মেজমামা দোতলার বারান্দা থেকে মাসীমাকে চিৎকার করে বললেন, 'ভুলে যাসনি, আমার ট্রেন রাত নটা চল্লিশে।'

ওদিকে বেলতলায় শ্যামজেঠার উদাত্ত গলা, 'রূপং দেহি, যশো দেহি।'

জোড়া উনুনে আগুন পড়েছে। গল-গল করে ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে গাছের ডালপালা ভেদ করে।

মেজমামা খুব উত্তেজিত হয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে বললেন, 'সেই সাতসকাল থেকে দেহি দেহি শুরু হয়েছে। যার অত দেহি দেহি সে হবে দাতাকর্ণ?'

ছটা কুকুর বাড়ি একেবারে মাথায় করে রেখেছে। যত অচেনা লোক দেখছে ততই ঘেউ-ঘেউ করছে। মাসীমা গ্লিসারিনে তুলো ভিজিয়ে কানে গুঁজে রেখেছেন। কোন কথাই শুনতে পাচ্ছেন না।

সে এক জ্বালা! জল চাইলে তেল এনে দিচ্ছেন।

পেয়ারা গাছের ডালে কাঁসার ঘড়ি বাঁধা হয়েছে। সাবেক কালের জিনিস। বেলা একটার সময় ঠ্যাং করে বাজিয়ে ঘোষণা করা হবে--শুরু হল। সবাই বসে পড়।

দেখতে দেখতে একটা বেজে গেল। ভজুয়া দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, চোখ বন্ধ করে, দুহাতে একটা লোহার রড ধরে ঘড়িতে ঘা মারল। সারা এলাকা কেঁপে উঠল ঠ্যাং শব্দে। আওয়াজ বটে। কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়।

সবার আগে এল জয় নিতাইয়ের দল। সপরিবারে, হই-হই করে। সকলেরই নাকে নিখুঁত রসকলি।

বোষ্টম, বোষ্টমী, গেঁড়ি গেঁড়ি ছেলে মেয়ে। এটা লাফায়, ওটা ছোটে। বড়টা ছোটটার মাথায় গাঁট্টা মারে। ছোটটা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। মা সবকটাকে ধরে পাইকারি পিটিয়ে দেয়। 'ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি', শ্যামজেঠার আর্তনাদ।

'বসে পড় সব, বসে পড় সব।'

ফোলডিং চেয়ার উলটে চার বছরের ছেলেটা মাটিতে চিৎপাত হল। বুকের ওপর চেয়ার। পায়ায় ঠ্যাং জড়িয়ে গেছে।

'জয় নেতাই, পড়ে গেছেরে বাপ। খেঁচকে তোল আপদটাকে।'

'তুলসী গাছ কোন্ দিকে?'

'তুলসী গাছ কি হবে গো?' ভজুয়া জিগ্যেস করল।

'দূর বেটা খোঁট্টা। তুলসীপাতা ছাড়া ভোগ হয়। বড়মামার তুলসীঝাড় ফাঁক।

পঁচিশ কোথায়? পিল-পিল করে লোক আসছে।

বড়মামা আঁতকে উঠলেন, 'মরেছে, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ রে! হাঁড়ি নয়, ড্রাম ড্রাম খিচুড়ি লাগবে। স্টপ দেব? অ্যানাউনস করে দে, পঁচিশ জনের বেশি সয়। গেটটা বন্ধ করে দে রাশকেল ভজুয়া।'

'গেট বন্ধ করে আটকান যাবে না ডাগদারবাবু? গেট টপকে চলে আসবে।'

'ধাক্কা মেরে বের করে দে।'

'মেরে শেষ করে দেবে বাবু।'

বড়মামা গলা চড়িয়ে বললেন, 'শুনুন, শুনুন আমাদের এই আয়োজন মাত্র পঁচিশ জনের জন্য।'

প্রত্যেকেই চিৎকার করে উঠল, 'আমি সেই পঁচিশজনের একজন।'

'তা কি করে হয়! এখানে অনেককেই দেখছি যাঁরা টেরিকটনের প্যান্ট শার্ট পরে এসেছেন। বড় বড় চুল। দে আর নট গরিব।'

চিৎকার উঠল, 'আমরা মডার্ন গরিব। বেকার বসে আছি বছরের পর বছর।'

'আমি মডেল গরিব বেছে নেব।'

'বেছে নোব মানে? এটা কি স্টেট লটারি? কে বেছে নেবে?'

বড়মামা খুব অসহায়ের মত বললেন, 'সে কি রে বাবা। এরা যে দেখছি তেরিয়া হয়ে উঠছে। বেশ, জোর যার মুলুক তার। আপনারা পঁচিশ জন বাকি সকলকে ঠেকিয়ে রাখুন। তাজিয়া কাজিয়া যা হয় নিজেরাই ফয়সালা করুন।'

মার, মার, হই হই, রই রই। হে রে রে রে করে লোক ঢুকছে।

যেন দশ আনার টিকিটের সিনেমার কাউন্টার খোলা হয়েছে। ভজুয়া পালাতে পালাতে বললে, 'আরও আসছে বাবু। নারায়ণকা জলুস নিকলেছে আজ।'

শ্যামজেঠা পালাতে পালাতে বললেন, 'সুধাংশু প্রাণে যদি বাঁচতে চাও, পেছনের দরজা দিয়ে পালাও।'

বড়মামা ভয়ে পেছতে পেছতে বললেন, 'য পলায়তি স জীবতি। ব্যাপারটা বুফে-লাঞ্চের মত হয়ে গেল। যে পারে সে নিয়ে খাক।'

চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেছে। বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলেছে! একপাশের সামিয়ানা কেতরে গেছে। পেছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় পড়ে বড়মামার লাল মটরবাইক তীরবেগে পশ্চিমে ছুটছে। মেজমামা কাঁপতে কাঁপতে টেলিফোন ডায়াল করছেন,

'হ্যালো থানা। নরনারায়ণে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে। বড় বড় থানইট ছুঁড়ছে। ও সেভ আস, সেভ আস।'

ছটা কুকুর বাগানে নেমে পড়েছে খেপে গিয়ে। মাসীমার কানে অ্যায়সা তুলো ঢুকেছে কিছুতেই বের করতে পারছেন না। মাথার কাঁটা, দেয়াশলাই কাঠি, যতই খোঁচাখুঁচি করছেন গ্লিসারিন-তুলো ততই ভেতরে চলে যাচ্ছে। কেবল বলছেন, 'এখনও চণ্ডীপাঠ হচ্ছে! শিলাবৃষ্টি হচ্ছে না কি রে।'

মেজমামা রিসিভার চেপে বলছেন,

'আর দাঁড়াতে পারছি না। আমার পা কাঁপছে। প্যান্ডিমো-নিয়াম! আরে দূর মশাই, হারমোনিয়াম নয় প্যান্ডিমোনিয়াম।'

বড়মামা প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে নীচে থেকে ওপরে উঠে এলেন। এমন চেহারা এর আগে আর কখনও দেখিনি। কপালের ডান পাশটা ফুলে ট্যাঁপা লাল। দু'হাতের কনুইয়ের কাছ পর্যন্ত কুঁচোকুঁচো খড় বড় বড় লোমের সঙ্গে আটকে আছে। চোখ দু'টো লাল টকটকে। গাঢ় নীল রঙের সিল্কের লুঙ্গি একটু উঁচু করে পরা। পায়ে কালো ওয়াটারপ্রুফ জুতো।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে বড়মামা দোতালার ঢাকা বারান্দায় উঠে এলেন। ঝলমলে রোদ জাফরির নকশা পেতে রেখেছে ঝকঝকে লাল মেঝের ওপর। দূর কোণে মেজমামা বসে বসে ক্যামেরার লেনস পরিষ্কার করছিলেন। আমি তাঁর ফাইফরমাস খাটছিলুম। এটা দে, ওটা দে!'

মেজমামার কোলের ওপর ক্যামেরা। হাতে হলদে রঙের ফ্ল্যানেলের টুকরো। চোখ আর ক্যামেরার দিকে নেই, বড়মামার দিকে। মেজমামা হঠাৎ বললেন, 'স্টপ। ঠিক ওই জায়গাতেই এক সেকেন্ড। আমি চট করে তোমার একটা স্ন্যাপ নিয়ে নি। তোমাকে ঠিক দিশি কাউবয়ের মত দেখাচ্ছে। বেড়ে দেখতে হয়েছ ত! কি করে হলো?'

বড়মামা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'শাট আপ। শা-আট আ-আপ!'

মেজমামা ফিস করে আমাকে বললেন, 'সাবজেক্‌ট্‌টা ভাল ছিল তবে একটু খেপে আছে।'

বড়মামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমাকে ডাকলেন, 'কাম হিয়ার। কুইক।'

'শুনে আসি মেজমামা।'

'হ্যাঁ শুনে আয়। কেসটা কি আমাকে জানিয়ে যাবি।'

'আচ্ছা।'

ঘরে ঢুকতেই বড়মামা বললেন, 'কি হবে?'

'কিসের কি হবে?'

'জুতো পরে ঢুকে পড়েছি যে!'

'ও কিছু হবে না।'

'এটা যে রাস্তার জুতো। কুসি দেখলে খ্যাঁক খ্যাঁক করবে।'

'মাসীমা ত এখন ধারে কাছে নেই।'

'মেজেতে যে দাগ পড়ে গেল!'

'আমি পা দিয়ে পালিশ করে দিচ্ছি।'

'আমি যে দাঁড়িয়ে পড়েছি!'

'চলতে চান ত চলে ফিরে বেড়ান না। অসুবিধে কিসের!'

'যেদিকে যাব সেই দিকেই ত দাগ পড়ে যাবে!'

'জুতো খুলে ফেলুন।'

'ইয়েস, দ্যাটস রাইট।'

বড়মামা জুতো খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে বারকতক নেচে নিলেন। লাল চকচকে মেজেতে নাচের জুতোর নকশা তৈরি হল।

'দেখলি, দেখলি! সাধে কুসি আমার ওপর রেগে যায়! রেগে যাবার অনেক কারণ আছে! পৃথিবীতে কোন কিছুই কি সহজ নয় রে!'

'জুতোটা না খুলে অমন করে নাচছেন কেন?'

বড়মামা রেগে উঠলেন, আমি কি ইচ্ছে করে নাচছি। আমাকে নাচাচ্ছে যে! রবারের জুতো পরে একবার দেখ না। পরা সহজ, তারপর পা থেকে আর খুলতে চায় না। কৃতদাসের জাত। পায়ে ধরে বসে থাকতে চায়।'

'এখন তা হলে কি হবে! সারাদিন এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

'আমি বরং দাগে দাগ মিলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। তুই ওই মারকিউরোক্রোমের শিশি আর খানিকটা তুলো নিয়ে আয়। ও, না।'

'কি হল আবার?'

'বাইরে ত উনি ক্যামেরা তাক করে বসে আছেন। এখুনি ফট্ করে একটা ছবি তুলে এত বড় করে বাঁধিয়ে রাখবেন।'

'তাহলে আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন, আমি পা থেকে জুতো দু'পাটি খুলে দি।'

'না, দেখে ফেলবে।'

'দেখলে কি হয়েছে? আর কেই বা দেখবে?'

'ও বাবা, দেখলে কি হয়েছে! হোল্ বাড়িতে হই-চই পড়ে যাবে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ভাগনেকে দিয়ে জুতো খোলাচ্ছে! মনে নেই সেদিনের কথা। তোকে বলেছিলুম পিঠে একটু তেল ঘষে দিবি, সেই নিয়ে কত রকমের কথা!'

'তাহলে আমি চেয়ারটাকে টেনে আনি, আপনি বসে বসে খুলে ফেলুন।'

'অগত্যা তাই করতে হবে। আমার আবার জুতোয় হাত দিতে কি রকম গা ঘিন-ঘিন করে। পায়ের জিনিস পায়ে পায়েই খোলা উচিত। আমারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল, এটা হল সন্ধ্যের জুতো, সকালের নয়।'

'সে আবার কি, জুতোর আবার সকাল-সন্ধ্যে আছে নাকি?'

'জুতোর নেই। শরীরের আছে। সারারাত ঘুমের পর সকালের শরীর হল ফুলো ফুলো, তাজা! মুখ ফুলো, চোখ ফুলো, হাত ফুলো, পা ফুলো। শরীর যত সন্ধ্যের দিকে এগোচ্ছে তত শুকোচ্ছে, চুপসে যাচ্ছে। এসব হল অ্যানাটমি, ফিজিওলজির ব্যাপার। ডাক্তার হলে বুঝতে পারতিস?'

বড়মামা ডাক্তার। চেয়ারটাকে প্রথমে দু'হাতে তুলে আনার চেষ্টা করলুম। ঘষটাতে ঘষটাতে আসছি তেলা মেঝের ওপর দিয়ে। চেয়ার ঠেলতে বেশ মজা লাগে। ইচ্ছে করেই বেশ একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনছি। সোজা রাস্তায় আসছি না। পথ ফুরিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি!

'একি, একি, অ্যাঁ ঘরের একি অবস্থা, তুই সারা ঘরে চেয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন! বসার জায়গা পাচ্ছিস না! ও মাগো, মেজেটার কি অবস্থা!'

দরজার সামনে মাসীমা। আমি যেখানে যেভাবে ছিলুম সেইভাবে, বড়মামাও সেই একই ভাবে কাঠের মত দাঁড়িয়ে।

বড়মামা চোখ দু'টো কেবল বুজিয়ে ফেলেছেন। এটা বড় মামার নিজস্ব টেকনিক। ভয় পেলেই চোখ বুজিয়ে ফেলা।

সেই চোখ বোজান অবস্থাতেই বড়মামা বললেন, 'কুসি, আমি আহত।'

'তোমাকে কিছু বললেই ত তুমি আহত!'

'আমি সেভাবে আহত নই, এই দেখ আমার কপাল।'

বড়মামা মাসীমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। কপালটা এর মধ্যে আরও ফুলেছে। থেঁতো হয়ে গেছে।

'তোমার কপালে এই সবই লেখা আছে আমরা জানতুম!'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।' মাসীমার পাশে মেজমামা এসে

দাঁড়িয়েছেন। হাতে ক্যামেরা।

মেজমামাকে দেখেই বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'ও, নো নো—নো ফটোগ্রাফ।'

'ছোট্ট করে একটা। ফ্যামিলি অ্যালবামে মানাবে ভাল।'

মাসীমা মেজমামাকে থামিয়ে দিলেন, 'রাখত তোমার ক্যামেরা। আগে ছবি তোলা শেখ। ঠ্যার ঠ্যার করে হাত কাঁপে, ফোকাস করতে পার না! কেবল পয়সা নষ্ট।'

'হাত কাঁপে! আমার হাত কাঁপে?'

'হ্যাঁ কাঁপে! ছবি না তুলে তোমার কম্পাউন্ডার হওয়া উচিত ছিল। জল দিয়ে পেনিসিলিন গোলাবার জন্যে কসরত করার দরকাব হত না, তোমার কাঁপা হাতে শিশিটা ধরিয়ে দিলেই আপনি গুলে যেত!'

মেজমামা একটু মুষড়ে গেলেও হেরে যেতে প্রস্তুত নন। আমার মামারা সহজে হারতে চাননা। মেজমামা বললেন, 'আমি যখন রেগে যাই তখনই আমার হাত কাঁপে, তা না হলে আমার হাত ল্যাম্প-পোস্টের মতই স্টেডি।'

তোমার সব সময়েই হাত কাঁপে, তা হলে বুঝতে হবে সব সময়েই রেগে আছ। কথা বাড়িওনা, যা করছিলে তাই করগে যাও।'

মাসীমাকে সুবিধে করতে না পেরে মেজমামা বড়মামার ওপর সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন।

'আহা, তোমার কপালটা বেশ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে বড়দা। কিসে ঠুকলে অমন করে!'

বড়মামা যেন হালে পানি পেলেন। মাসীমা যেভাবে তাকিয়ে আছেন, একমাত্র কপালের জোরেই বড়মামা বাঁচতে পারেন।

'ঠোকা? ঠোকাঠুকির মধ্যে আমি নেই। ওই লক্ষ্মীছাড়া! যার নাম রাখা হয়েছিল লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মী পেছনের পায়ে ঝেড়েছে এক লাথি।'

আমি চেয়ারটা যেখানে ছিল সেইখানেই চতুষ্পদ করে রেখে, ওষুধ আর তুলো নিয়ে মাসীমার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমাকেও ত একটা বাঁচার রাস্তা বের করতে হবে। সারা মেজেতে চেয়ার টানার

লম্বা লম্বা দাগ।

'এই নিন মাসীমা, ওষুধ।'

মাসীমা ওষুধ আর তুলোটা হাতে নিয়ে বড়মামাকে ধমকের সুরে বললেন,

'তুমি সাত-সকালে গরুর কাছে কি করতে গিয়েছিলে? তোমার অন্য কোনও কাজ ছিল না!'

মেজমামা বললেন, 'হ্যাঁ ঠিকই ত, তোমার অন্য কোনও কাজ ছিল না! তুমি কি পশু চিকিৎসক? তুমি ত মনুষ্য চিকিৎসক!'

বড়মামা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাও, কথা শোন দু'জনের! যা হয় একটা কিছু বলে দিলেই হল! তোরা জানিসনা?'

'কি জানতে হবে?' মাসীমা তুলোয় লাল ওষুধ লাগালেন।

'তোরা জানিসনা, আমার সব কটা কাজের লোক পালিয়ে গেছে। মালি গন। কুকুরগুলোকে দেখত সেই বিশে ব্যাটা হাওয়া। গরুটাকে যে দেখত সেই রামখেলোয়ান সরে পড়েছে। দেন হু উইল বেল দ্য ক্যাট? তোমরাই বল?'

'ইংরেজিটা ঠিক হল না বড়দা।' অধ্যাপক মেজমামা আবার বানান ভুল, ভাষার ব্যবহারের ভুল একেবারেই সহ্য করতে পারেন না।

'তোমার অবশ্য দোষ নেই। তুমি ত লিটারেচারের লোক নও। সারা জীবন প্রেসক্রিপসানই লিখে গেলে, টিডি, বিডি। তোমার বলা উচিত ছিল…।'

মাসীমা কটমট করে মেজমামার দিকে তাকাতেই মেজমামা আমতা আমতা করে চুপ হয়ে গেলেন, যেন গান শেষ হল, 'না, মানে ভুল, মানে বেল মানে, ক্যাট দি বেল মানে, না না বেল দি ক্যাট মানে,…'

মাসীমা আবার তাকাতেই মেজমামার রেকর্ড একেবারেই থেমে গেল।

'দেখি কপালটা নীচু কর। ওঃ লম্বা বটে! তালগাছ।'

বড়মামা অভ্যর্থনা সভার সভাপতির মত কপালে যেন তিলক নিচ্ছেন।

মাসীমা একহাতে বড়মাথার পেছন দিকটা ধরে সামনে ঝুঁকিয়ে আর এক হাতে অ্যান্টিসেপটিকে ভেজান তুলো থ্যাঁতলান কপালে চেপে ধরেছেন। বড়মামার যেন চুল কাটা হচ্ছে সেলুনে। তুলোটা কপালে চেপে ধরতেই বড়মামা বিশাল একটা চিৎকার ছাড়লেন। মানুষ উঁচু ছাদ থেকে পড়ে যাবার সময়েই অমন চিৎকার করে। চিৎকার শুনেই কোথা থেকে ছুটে এল বড়মামার কুকুরদের অন্যতম, সবচেয়ে দুর্দান্ত স্প্যানিয়েল, 'ঝড়ু'। সবকটা কুকুরেরই বাঙলা নাম। ঝড়ু, সুকু, ডাকু।

ঝড়ু বড়মামাকে বাঁচাতে এসেছে। সামনের থাবার ওপর মুখ নামিয়ে, ঝিঁকি মেরে মেরে, বার কতক ঘেউ ঘেউ করে খুব খানিকটা বকাঝকা করল। যখন দেখল মাসীমা তবু তার প্রভুকে ছাড়ছে না, তখন শাড়ির আঁচল ধরে হিড়হিড় করে টানতে শুরু করল। ফাইন লাগছিল ব্যাপারটা। ঝড়ুর মুখটা ভারি সুন্দর। সেই মুখে আঁচলের আধখানা, পেছনের দু'পায়ে ভর রেখে, মুখটা সামান্য ওপরে তুলে, টান টান, টানাটানি, টাগ অফ ওয়ার।

বড়মামার কপাল ততক্ষণে মেরামত হয়ে গেছে। মাসীমার দু'হাত এখন মুক্ত। দু'হাতে আঁচল ধরে টানছেন। নতুন শাড়ি। সহজে ছিঁড়ছে না, কুকুরেও ছাড়ছে না। মেজমামা তারিফ করে বললেন,

'ডগ ইজ এ ফেথফুল অ্যানিম্যাল। প্রভুভক্ত জীব।'

'প্রভুভক্তি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি। এই, লাঠিটা নিয়ে আয় ত।'

লাঠির নাম শুনে ঝড়ু একটু থমকে দাঁড়াল, তারপর চোখ দুটো আধ-বোজা করে যেমন টানছিল তেমনি টানতে লাগল, ঝটকা মারতে লাগল, খোঁটায় বাঁধা প্রাণীর মত অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল। বড়মামা একটু সামলেছেন। মুখ দেখে মনে হল ঝড়ুর বীরত্ব ও প্রভুভক্তিতে বেশ গর্বিত। তবে লাঠি থেকে বাঁচতে হবে। ভক্তেরই ত ভগবান! বড়মামা শাসনের সুরে বললেন,

ঝড়ু, ঝড়ু, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, নো অসভ্যতা।'

উত্তরে ঝড়ু আরও মরিয়া হয়ে মাসীমার আঁচলে হ্যাঁচকা টান মারতে লাগল। মেজমামা বললেন, 'ঝড়ু ছাড়া ঝড়ুর কিছু করতে

পারবে না। কুকুরের সঙ্গে কুকুরের ল্যাঙ্গোয়েজেই কথা বলতে হবে।'
বড়মামা কুকুরের পক্ষেই গেলেন, 'আসলে কি হয়েছে জানিস, কুকুরের ত বাঁকা বাঁকা দাঁত, কুসির শাড়িটা তাঁতের জ্যালজেলে, দাঁতে আটকে গ্যাছে ও টানছে না ও দাঁত থেকে খুলে ফেলার জন্যে ছটফট করছে। দেখি কাঁচিটা দেখি, এ কেসটা হল সার্জারির কেস।'

মাসীমা বললেন, 'শাড়িটার দাম জান? সেভেনটি-সিকস। সার্জারি নয় লাথি।'

মাসীমা সত্যিই সত্যিই একটা লাথি চালালেন। ঝড়ুর গায়ে লাগল না কিন্তু ভয়ে ছেড়ে দিল। শাড়ির আঁচলটা ফুটো ফুটো, চিবোনো চিবোনো। মাসীমার চোখে জল এসে গেছে।

'আজই নতুন শাড়িটা সবে ভেঙ্গে পরলুম, হতচ্ছাড়া, জানোয়ার কুকুর। শাড়িটার কি সুন্দর রঙ ছিল!' মাসীমার কাঁদ কাঁদ গলা শুনে মেজমামা বললেন,

'ছিল বলছিস কেন, এখনও ত সুন্দর রঙই রয়েছে। জলে পড়লে রঙ ওঠে, কুকুর ধরলে রঙ উঠবে কেন?'

বড়মামা বললেন, 'বারো হাত শাড়ির হাত খানেক কেটে ফেলে দিলেও এগার হাত থাকে। যে কোন মহিলার পক্ষে এগার হাত যথেষ্ট। কি বল?'

মেজমামা বললেন, 'ইয়েস ইয়েস। ইলেভেন ইয়ার্ডস' —

'তোমার ইংরেজীটা শুদ্ধ কর, ইয়ার্ড মানে গজ, হাত নয়।' বড়মামা হঠাৎ সুযোগ পেয়ে গেছেন।

নীচে 'হাম্বা' করে একটা শব্দ শোনা গেল, 'গরু খুলে গেছে, ওমা গরু খুলে গেছে, গরু যাঃ যাঃ, হায় গো, ডাঁটার ঝাড়টা নিয়ে পালাল গো!'

'কি হল মানুর মা!' মাসীমা শাড়ির শোক ভুলে সিঁড়ির দিকে দৌড়োলেন।

মেজমামা বললেন, 'দাদা, তোমার ভিটামিন বি কমপ্লেকস গবায় নমঃ হয়ে গেল। আসল কাটোয়ার ডেঙ্গো ছিল।'

বড়মামা বললেন, 'নো ক্ষমা, আর ক্ষমা করা চলে না, সেই লাইনটা, অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে—'

আমরা সদলে নীচের উঠনে নেমে এলাম। মাসীমার পেছনে ঝুলছে কুকুরে চিবোন আঁচল। পেছনে আমি। আমার পেছনে বড়মামা। বড়মামার পেছনে মেজমামা।

লক্ষ্মীছাড়া লক্ষ্মী উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখ বুজিয়ে ডেঙ্গোর ঝাড় চিবোচ্ছে। এত চিৎকার, চেঁচামেচি, কোনদিকে কোন দৃকপাত নেই। নিজের কাজ করে যাচ্ছে আপন মনে। ডাঁটা ঝাড়ের আধখানা চলে গেছে গলায়, বাকি অংশটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে ঢুকছে। মাসীমা সেই বাড়তি অংশটা ধরে টানাটানি শুরু করলেন। যতটুকু পারা যায় উদ্ধারের চেষ্টা। মেজমামা গম্ভীর গলায় বললেন,

'ছেড়ে দে কুসি। পারবি না। বোভাইন-টিথের স্ট্রাকচার জানা থাকলে তুই আর চেষ্টা করতিস না। গরুর ওপর আর নীচের পাটিতে কটা করে দাঁত, কি ভাবে সাজান থাকে জানিস?'

মাসীমা বললেন, 'তোমরা জান, আমার জেনে দরকার নেই।' মাসীমা পাতা ধরে টানতে লাগলেন। লক্ষ্মী চিবিয়েই চলেছে। এক ঝটকায় মাসীমাকে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে টলমল করে দিয়ে লক্ষ্মী পেছন ফিরে দাঁড়াল। ন্যাজটা মাঝে মাঝে দুলছে। বিরক্তি ভাল লাগছে না তার। শান্তিতে কাটোয়ার ডাঁটা চিবোতে চায়। গরুটাকে দেখতে ছবির গরুর মত। সাদা ধবধবে গায়ের রঙ। ন্যাজের দিকটা চামরের মত। ডগাটা কালো। শিং দুটো তেলা। চোখ দুটো বড় বড়, ভাসা ভাসা।

'বড়মামা আপনার গরুটাকে ভারি সুন্দর দেখতে।'

'অতি অসভ্য গরু। একগুঁয়ে, অবুঝ। গরুর সম্পর্কে আমার ধারণা পালটে দিয়েছে। মানুষের চেয়েও অসভ্য!' মাসীমা কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। সামলে নিলেও ভীষণ রেগে গেছেন।

অনেকদিন তোমাকে বলেছি দাদা, তোমার এই গরু কুকুর এসব হটাও। বাড়িতে টেঁকা যায় না। এ আমাদের কম সর্বনাশ করেছে! আদরে আদরে বাঁদর তৈরি হয়েছে।'

বড়মামা বললেন, 'আর মায়া নয়, আজই একে বিদায় করতে হবে। মানুর মা, আজই, এখনই তুমি এটাকে নিয়ে যাও।'

'আমি গরু নিয়ে কি করব দাদাবাবু! আমার নিজেরই থাকার জায়গা নেই। চাল নেই, চুলো নেই।'

'কেন, তোমার বাড়ির পাশের মাঠে বেঁধে রেখে দেবে। যখন দুধ হবে দুধ খাবে, দই খাবে, ক্ষীর খাবে, চেহারা ফিরে যাবে।'

মেজমামা বললেন, 'মাঝে মাঝে' লাথিও খাবে। সভ্যতা এতবছর এগিয়ে গেল, গরু কিন্তু সেই গরুই রয়ে গেল। প্যালিওলিথিক গরু, নিওলিথিক গর আর এই স্পেস এজ গরু, বিবর্তনের ধারাটা কত সোজা দেখেছ দাদা! আমরা কত অসম্ভবকে সম্ভব করলুম! গরু কোনও দিন ভাবতে পেরেছিল, তার তরল দুধকে আমরা গুঁড়ো করে টিনে ভরে ফেলব?'

উঠোনে একটা বাঁধান বসার জায়গা ছিল, বড়মামা তার ওপর বসে পড়লেন। চুল উড়ছে। কপালের একটা পাশ গোলাপী। ফর্সা চেহারায় বেশ মানিয়েছে। মাসীমা ডাঁটা উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়ে ভীষণ যেন রেগে গেলেন। সকালে বাজার এসেছে। মানুর মা সব ধুয়ে ধুয়ে রেখেছে। আলু, পটল, উচ্ছে, কুমড়ো, কাঁচালঙ্কা পাতিলেবু।

'এই নে সব খা, সৃষ্টি খা, তুইই খা'। ঝুড়িসুদ্ধ সব টান মেরে মাসীমা লক্ষ্মীর মুখের সামনে ছড়িয়ে দিলেন।

লক্ষ্মী খুব চালাক গরু, ভেবেছিলুম পটলের সঙ্গে লঙ্কা চিবিয়ে আর একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। লক্ষ্মী জানে কোনটার পর কি খেতে হয়। সে কুমড়োটা মুখে পুরেছে। ডেঙ্গো শাক কুমড়ো দিয়েই রাঁধে। এরপরই হয়ত আলু আর পটল খাবে, সঙ্গে একটা কাঁচালঙ্কা। পেটে গিয়ে হয়ে যাবে আলু পটলের ডালনা।

মেজমামা বললেন, 'শিশু আর গরু বুদ্ধিবৃত্তিতে সমান স্তরের প্রাণী। যা পাবে তাই মুখে পুরবে। যতরকমের অপকর্ম আছে নির্বিবাদে করে যাবে। হ্যাঁ, শিশু আর গরু এক জিনিস, সেম থিঙ্গস, চেহারা ছাড়া সব এক।'

বড়মামা বললেন, 'তা হলে দেখ, সেই শিশু স্নেহ পায় বলেই মানুষ হয়। গরুর বেলায় উল্টো। গরু স্নেহ পায় না, তাই বড় হয়েও গরুর গরুমি যায় না। হ্যাঁরে বাঙলাটা ঠিক হল ত?'

'কি বললে, গরুমি ! বাঁদর, বাঁদরামি, পাগল, পাগলামি, ছাগল, ছাগলামি, গরু থেকে বোধহয় গবরামি হবে। সংস্কৃত গো শব্দ থেকে উৎপত্তি। গো, আর, রামি।'

'আমরা কত স্বার্থপর দেখ ? গরু মানেই আমাদের কাছে দুধ, মাখন, ছানা, দই, রসগোল্লা, গব্য ঘৃত, ফুলকো লুচি !'

হঠাৎ লক্ষ্মী একটা লাফ মারল। বালতি, ঝুড়ি সব উলটে পালটে, সেই ছোট্ট উঠোনে টাট্টু ঘোড়ার মত গোল হয়ে ছুটতে লাগল। মাসীমা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন। মেজমামা দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ধাপে, বড়মামা যে বেদিটায় বসেছিল সেইটার ওপর উঠে দাঁড়ালেন।

দোতলার বারান্দা থেকে আমি বললুম, 'ওর ঝাল লেগেছে বড়মামা, কাঁচালঙ্কা খেয়েছে।'

'একটু পরেই রতন আসবে।'

রতনের খাটাল আছে। মাসীমাই রতনের কথাটা বললেন। বড়মামা যেন ধড়ে প্রাণ পেলেন। বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, কু-সি ! রতনের ওখানে থাকলে লক্ষ্মীটি মানুষ হবে সঙ্গী পাবে। একটা প্রতিযোগিতার ভাব আসবে। আর পাঁচটা গরুকে দুধ দিতে দেখলে নিজের দুধ দেবার ইচ্ছে হবে।'

মেজমামা বললেন, 'ইয়েস, কম্পিটিসন। প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকলে গরু ভালো রেজাল্ট দেখাতে পারবে।'

লক্ষ্মী সেজেগুজে রেডি হল। নীল নাইলনের দড়ি। গোয়াল থেকে উঠোনে এসেছে, একটু পরেই সদর দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

'বাবু আছেন, ডাক্তার বাবু ?' ওই যে রতন এসে গেছে। গায়ে হলদেটে ফতুয়া। নীচের দিকে দু'টো পকেট, নানা রকম জিনিসে ফুলে আছে। লুঙ্গিটা একটু উঁচু করে পরা। কালো তেল চুকচুকে রঙ কদমছাঁট কাঁচা-পাকা চুল।

'এস, রতন এস।' ধরাধরা গলায় রতনকে ডাকলেন।

'বাঃ লক্ষ্মী ত লক্ষ্মীই, বেশ চেহারাটি ! গরু হলে এই রকম গরু হওয়াই উচিত।'

'একটা রিকোয়েস্ট রতন, তুমি নজর দিওনা।'

'হাসালেন ডাক্তার বাবু, ও ত এখন থেকে আমার নজরেই থাকবে। আমি চেহারা-ফেয়ারা বুঝিনা, আমি বুঝি দুদ্। দুদ্ দিলে খাতির, না দিলে জুতো।'

'জুতো মানে, গরুকে জুতো পেটা?'

'নানা, হিন্দুর ছেলে গরুকে জুতো মারতে পারি? মহাপাপ! গরু মেরে জুতো তৈরী হবে।'

বড়মামা চমকে উঠে লক্ষ্মীর পিঠে আঙুল ঠেকালেন। তার গাটা কেঁপে উঠল থির থির করে। ন্যাজটা দুলে উঠলো চামরের মত।

'অবাক হবার কি আছে এতে!' রতন বলল, 'এত জুতো তাহলে আসবে কোথা থেকে? লাখ্‌লাখ্ জোড়া পা, লাখ্‌লাখ্ জোড়া জুতো। বুঝলেন ডাক্তারবাবু গরু বড় উপকারী জন্তু!' রতন লক্ষ্মীর পিঠে হাত রেখে বলল এই দেখুন চামড়া, কমসে কম একশো জোড়া জুতো হবে। এই শিং আর পায়ের খুর থেকে কেজি খানেক শিরিস তৈরী হবে। তারপর হাড়। হাড় থেকে তৈরি হবে বোন মিল। গরু কি মানুষ? মরল আর পুড়ে ছাই হল?'

বড়মামা রতনের কথা শুনে লক্ষ্মীর গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। রতন তখনও শেষ করেনি কথা।

'ওই জন্যে আমরা করি কি, ফুকো দি।'

'ফুকো? সে আবার কি?'

'ডাক্তারবাবু, বিজ্ঞানের কম উন্নতি হয়েছে? ফুকো হল ইঞ্জেকসান।'

'ও ইঞ্জেকসান।' বড়মামা খুশি হলেন. 'ভাল ভাল, গরুর স্বাস্থ্য ঠিক রাখলে দেশের স্বাস্থ্য ভাল হবে।'

'সে ইঞ্জেকসান নয়, দুধ বাড়াবার ইঞ্জেকসান। যে গরু আড়াই দেয় সে দেবে পাঁচ, যে পাঁচ দেয় সে দেবে দশ। ডবল ডবল দুধ, ডবল ডবল রোজগার, হ্যা হ্যা।'

'ম্যাজিক নাকি? সে ত জল মেশালেই দুধ বাড়ে!'

'তা বাড়ে, তবে দুধ বাড়লে জল বাড়ে, সব মিলিয়ে আরও বাড়ে। ফুকো দিলে গরুর রক্তটাই দুধ হয়ে বেরিয়ে আসে। হিসেব

করুন না, একটা গরু দশ বছর বেঁচে আড়াই সের দুধ দেওয়া লাভের, না পাঁচ বছর বেঁচে পাঁচসের দেওয়া লাভের? নিজে ত খাইয়ে দেখেছেন গরুর খোরাক ত জানেন? যত তাড়াতাড়ি পার সব দুধ শুষে নিয়ে, জ্যান্ত কঙ্কালটাকে কষাইখানায় পাঠিয়ে দাও। হ্যা হ্যা। চল লক্ষ্মী চল।'

'বেরোও! গেট আউট', বড়মামা পা থেকে জুতো খুলে হাতে নিয়েছেন। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। 'চামার, তুমি গরুরও অধম। নিকালো আভি নিকালো।'

বড়মামা ঠকঠক করে কাঁপছেন। মাসীমা দৌড়ে এসে বড়মামাকে ধরেছেন। রতন বলছে, কি হল, হঠাৎ! বেলাড পেসার মনে হচ্ছে।'. মেজমামা ইসারা করে রতনকে চলে যেতে বলছেন। লক্ষ্মী গরু হলেও তার বোধশক্তি আছে। লম্বা জিভ দিয়ে বড়মামার পিঠ চেটে দিচ্ছে। তবে ওই, সামান্য একটু ভুল করে ফেলল। বড়মামার পৈতেটা তার মুখে। সে আর কি হবে। মানুষের কাজেও অনেক ভুল থাকে।'

তিন

বড়মামা সকাল থেকেই পেয়ারের কুকুর লাকির ওপর ভীষণ রেগে গেছেন। পাশের ঘর থেকে শুনছি আমরা, চা-বিস্কুট খেতে খেতে হচ্ছে, "বেরিয়ে যাও ইডিয়েট, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না জানোয়ার, রাসকেল। একটা বিস্কুট আমার দেওয়া ডিউটি, এই নাও। গেট আউট গেট আউট। না না, ডোন্ট টাচ্ মাই বডি। উঁহুঁ উঁহু, আদর নয়, আদর নয়। যাও, যাও। মোহন! মোহন! ইডিয়েট মোহন!"

মেজমামা আর আমি এ ঘরে বসে, চা খেতে খেতে গল্প করছিলুম। মেজমামা আমাকে আবিসিনিয়ার কাফ্রীদের গল্প বলছিলেন। এমনভাবে বলছিলেন যেন এই মাত্র ঘুরে এলেন। কথা বলতে বলতে মেজমামার খুব হাত পা নাড়ার অভ্যাস। দুবার কাপ উল্টে যাবার মতো হয়েছিল। গল্পের গভীরে ঢুকে গেলে

তখন আর কাপ ডিসের খেয়াল থাকে না। বড়মামা যখন পাশের ঘর থেকে 'মোহন মোহন' করে চিৎকার করছেন মেজমামা তখন বর্শার ফলায় মানুষের মুণ্ডু গিঁথে নাচাচ্ছেন। বড়মামার চিৎকারে ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন। গল্প বলার মেজাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাকে বললেন, "বলে এসো তো. মোহন মারা গেছে। আর বলে এসো, ডোন্ড শাওট।"

মেজমামার হাত থেকে ছাড়া পাবার সব চেয়ে বড় সুযোগ। সকালবেলাই সারা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবেন। মাঝে মাঝে উটকো প্রশ্ন করে আমার জ্ঞান পরীক্ষা করবেন। না পারলেই মিনিটখানেক ছি ছি শব্দ করে বলবেন, যাও, এনসাইক্লোপিডিয়ার ছ ভল্যুমটা নিয়ে এসো. নিয়ে এসো বারো. কি সাত। প্রত্যেকবার টুলে উঠে-উঠে ভারি-ভারি বই পাড়ো ধুলো ঝাড়ো। আর পাতার পর পাতা রিডিং পড়ো। গরমের ছুটিতে মামার বাড়িতে কি এই জন্যে আসা। এসেছি বাগানের আম. জাম. জামরুল, ফলসা খেতে।

বড়মামার ঘরের দরজার সামনে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ভেতরের দৃশ্যটা দেখার মতো। দরজার পর্দাটা একপাশে সরানো। জানলার কাছের ছোট টেবিলে, দরজার দিকে পিছন ফিরে বড়মামা বসে আছেন। টকটকে লাল সিল্কের লুঙ্গি। গায়ে ধবধবে সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি। পৈতেটা দেখা যাচ্ছে। পৈতের সঙ্গে বাঁধা চাবি কোমরের কাছে দুলছে। ফর্সা চেহারা। চওড়া পিঠ। নধর মাংসল দুটো হাত।

চেয়ারের হাতলের ওপর সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে লাকি লাল মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সারা গা-ভর্তি সাদা-সাদা বড়-বড় লোম। মুখটা ভারী মিষ্টি। ঝুমকো-ঝুমকো লোমের ভেতর থেকে চকচকে দুটো চোখ উঁকি মারছে। লাকি চেষ্টা করছে বড়মামার সঙ্গে ভাব করতে। মুখটাকে ছুঁচলো করে ফোঁস ফোঁস করে শুঁকছে। মাঝে মাঝে জিভ বের করে বড়মামার হাতের ওপর দিকটা চুক চুক করে চেটে দিচ্ছে। লাকি যত কাছাকাছি সরে আসার চেষ্টা করছে, বড়মামা ততই শরীরটাকে ডানদিকে মুচড়ে মুখ ঘুরিয়ে বোঝাতে চাইছেন, লাকির সঙ্গে তাঁর কোন

সম্পর্ক নেই। আর ডানদিকে ঘোরানো সেই মুখ অনবরত চিৎকার করে চলেছে, 'মোহন, মোহন'।

আমি ঘরে ঢুকতেই লাকি নেমে পড়ল। মুখ নিচু করে আমার কাছে এসে ফোঁস ফোঁস করে বার কতক আমাকে শুঁকে, বুকের ওপর দুটো পা তুলে জিভ বের করে হ্যা হ্যা করল কিছুক্ষণ। বড়মামা তখনও মুখ ঘুরিয়ে আছেন। কুকুরের মুখ দেখবেন না। বড়মামা ভেবেছেন, মোহন এসেছে। বেশ রেগেই বললেন, "কোথায় থাকিস রাস্কেল! ইডিয়েটটাকে ঘর থেকে বের করে দে। বলে দে, আমার সঙ্গে ওর আর কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো সম্পর্ক নেই!"

"কেন বড়মামা?"

আমার গলা পেয়ে বড়মামা খুব লজ্জা পেয়ে ঘুরে বসলেন। হাসতে গিয়েও হাসলেন না। হাসলেই লাকি দেখে ফেলবে। মুখটাকে বেশ চেষ্টা করে গম্ভীর রেখেই বললেন, "ও, তুমি! আমি ভেবেছিলুম মোহনানন্দ। সকাল থেকে তিনি কোথায় আনন্দ করতে গেলেন?"

লাকিটা এমন করছিল, মাথায় হাত রেখে একটু আদর না করে পারলুম না। বড়মামা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "ওর সঙ্গে একদম মিশবে না। একেবারে বখে গেছে। উচ্ছন্নে গেছে!"

"কেন বড়মামা?"

"ওকেই জিজ্ঞেস করো।"

সে আবার কী! ওকে জিজ্ঞেস করব কী। বড়মামার কুকুর কথা বলে নাকি।

"ও কী করে বলবে বড়মামা! ও কি কথা বলতে পারে।"

"সব পারে, সব পারে, ওর মতো পাকা সব পারে! শুনবে ওর কীর্তি? অকৃতজ্ঞতায় ও মানুষের ওপর যায়, এমন কি তোমার মেজমামাকেও ছাড়িয়ে যায়!"

আবার মেজমামাকে ধরে টানাটানি কেন। মেজতে বড়তে ভাবও যেমন, ঝগড়াও তেমন। গতকাল রাতে খেতে বসে আম নিয়ে ঝগড়ার জের চলেছে বুঝলাম। বড়মামা করে নাকি গোলাপখাস বলে নার্শারি থেকে একটা আমগাছ খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে বাগানে

বসিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সিরাজউদ্দৌলার বাগানেই খালি এই আম হত, এইবার হবে সুধাংশু মুকুজ্যের বাগানে। সেই গাছে এ বছর প্রথম আম ধরেছে। আর সেই আম খাওয়া হচ্ছিল সেই রাতে। মেজমামা ঘন দুধে আম চটকে এক চুমুক খেয়েই, ব্যালাব্যাম বলে মুখের একটা শব্দ করে বাটিটা নামিয়ে রেখেই বললেন, "বড়দা, এই তোমার গোলাপখাস, এর নাম তেঁতুলখাস। দুধটাই নষ্ট হয়ে গেল। কী ক্ষতিই যে হল! দুধ না খেলে আমার আবার সকালে ভীষণ অসুবিধে হয়।"

বড়মামা ততক্ষণে আমটা চেখেছেন। বড়মামার মুখের চেহারাও ভীষণ করুণ। কিন্তু মেজর কাছে হেরে গেলে চলবে না। বললেন, "জীবনে রিয়েল গোলাপখাস তো খাসনি। সে খেয়েছি আমরা। গোলাপখাস একটু টকমিষ্টিই হয়! তবেই না তার টেস্ট। তোর মতো নাবালকের বোম্বাই-টোম্বাই খাওয়া উচিত।"

রাত এগারোটা পর্যন্ত এঁটো হাতে দু'ভাইয়ে আম নিয়ে খুব দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল। শেষে সিদ্ধান্ত হল, বড়মামার গাছ বড়মামারই থাক। মেজমামা ল্যাংড়াই খাবেন। গোলাপ ফুল ভদ্রলোকে হয়তো সহ্য করতে পারে, তবে গোলাপখাস ভদ্রলোকের আম নয়। শিশুরা খেতে পারে, কারণ শিশু আর ছাগল একই জাতের জিনিস।

বড়মামা লাকির অকৃতজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে মেজমামার সঙ্গে তুলনা করলেন। করে বললেন, "কুকুর কখনও মানুষ হয় না, বুঝেছ? মানুষ কিন্তু কুকুর হতে পারে।"

কথাটা শুনে কিনা জানি না, লাকি বারকতক ভেউ ভেউ করে উঠল। বড়মামা বললেন, "ওকে চুপ করতে বলো। এখানে কাজের কথা হচ্ছে।"

আমাকে বলতে হল না। বুদ্ধিমান কুকুর নিজেই বুঝতে পেরেছে। সামনের থাবায় মুখ রেখে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বড়মামা আড়চোখে একবার দেখে আবার শুরু করলেন, "মাসে কুড়ি টাকার বিস্কুট। সত্তর টাকার মাংস। পঞ্চাশ টাকার দুধ। তিন কৌটো পাউডার। পঁচিশ টাকার ওষুধ। পনের টাকার সাবান। সব, সব ভস্মে ঘি ঢালা। সেই অকৃতজ্ঞ কুকুর

আজ আমাকে অপমান করেছে। নিজের ভাই অপমান করলে সহ্য হয়, প্রতিবেশী লাথি মারলেও হজম করে নিতে হয়। নিজের কুকুর অপমান করলে সহ্য হয় না। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে।"

বড়মামা লাকির দিকে সামান্য ঝুঁকে বেশ জোরে জোরে বলে উঠলেন, "বুঝেছিস ? আত্মহত্যা, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। না, নো, নো, ন্যাজ নাড়লে আমি আর ভুলছি না। তোমার ন্যাজের খেলা আমার জানা হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। নো সম্পর্ক।"

লাকি সামনের থাবায় সেইভাবে মুখ রেখে চোখ বুজিয়ে বুজিয়ে, পটাক পটাক করে ন্যাজ নাড়ছে।

এতক্ষণ অনেক কথা হল, বড়মামার রাগের কারণটা কিন্তু বোঝা গেল না। কাল রাতে যাবার আগে, আম নিয়ে মেজমামার সঙ্গে রাগারাগি হয়ে যাবার পর খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে, কুকুরকে পেটের ওপর ফেলে বড়মামা যেসব কথা বলেছিলেন তার কিছু কিছু তো এখন মনে আছে। বুরুশ বোলানো হচ্ছে কুকুরের লোমে, আর কথা হচ্ছে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি, তুই এবার একদিন মানুষের মতো কথা বলবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানুষের চেয়ে তুই ফার, ফার, ফার, ফার বেটার। অ্যাই কী হচ্ছে কী, নাল লেগে যাচ্ছে না মুখে! উঁহু, উঁহু, আর না, আর না। দেখি পেটের দিকটা, চিত হও, চিত হও। কী হল, কাতুকুতু লাগছে ?"

সেই কুকুর কী এমন করল। এই সাতসকালে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মেজমামা ওদিকে হাঁকাহাঁকি শুরু করেছেন। "কী হল হে তোমার! এখানে জ্ঞানের কথা হচ্ছে, ভাল লাগবে কেন! গিয়ে পড়লে কুকুরের খপ্পরে।"

বড়মামার কপালটা একটু কুঁচকে গেল। আমাকে বললেন, "জিজ্ঞেস করো তো কুকুর কি জ্ঞানের জগতের বাইরে। দর্শন-শাস্ত্রটাই জ্ঞান, প্রাণী-তত্ত্বটা জ্ঞান নয়, ফেলনা জিনিস ? জিজ্ঞেস করো তো পৃথিবীতে কত রকমের কুকুর আছে, জানে কিনা! ওর জ্ঞানের দৌড় জানা আছে। পৃথিবীটাই জানা হল না, উনি ঈশ্বর ভগবান এই সব নিয়ে ভেবে ভেবে মরে গেলেন।"

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললুম, "এখুনি আসছি মেজমামা।"

"ধ্যাত! তোর আঠার মাসে বছর। আসতে আসতেই আমার কলেজ যাবার সময় হয়ে যাবে। ভেবেছিলুম, পৃথিবীর একটা পার্ট শেষ করে যাব।"

কথা শেষ করেই মেজমামা 'মোহন, মোহন' করে চেঁচাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে বড়মামারও মনে পড়ল মোহনের কথা। দুজনেই তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন, 'মোহন, মোহন!'

লাকিটা বকুনি-টকুনি খেয়ে বেশ ঘুমিয়ে পড়েছিল। চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে পড়ে, ছোট্ট একটা ডন মেরেই বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বার কতক ভেউ ভেউ করে রাস্তার দিকের জানলায় পা দুটো তুলে দাঁড়াল।

আমি এক কদম এগিয়ে ব্যাপারটা দেখে নিলুম। কেন কুকুরটা ওরকম করছে! সামনের বাড়ির বারান্দায় ঠিক লাকির মতো আর একটা কুকুর এ জানালার দিকে তাকিয়ে আছে আর পুটুক পুটুক ন্যাজ নাড়ছে। ও কুকুরটা কিন্তু এটার মত কেঁউ কেঁউ করছে না বা পাগলের মতো দৌড়োদৌড়ি করছে না। দেখলেই মনে হয় কুকুরটা একটু দুষ্টু ধরনের। আমার বন্ধু অরুণের মতো। পড়ার ঘরে বেশ মন দিয়ে হয়ত পড়তে বসেছি, বাইরের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখে একটুও কথা নেই। মুচকি মুচকি হাসি, স্থির দৃষ্টি। চোখের পাতা নাচিয়ে যা বলার বলে গেল—বইপত্তর মুড়ে উঠে আয়, পড়ার সময় অনেক পাবি, এমন সকাল পাবি কোথায়! অমনি, এই লাকির মতোই মনটা আঁকুপাঁকু করতে লাগল। বাইরের চুপচাপ লাকি ভেতরের বন্দী লাকিকে ডাকছে।

"আজ সকাল থেকে তুমি এই করছ।" বড়মামার তর্জন-গর্জন থামেই না দেখি। সকালেই আমি তোমাকে ভাল কথায় বুঝিয়েছি, বাইরে যাওয়া চলবে না, বাইরের কুকুরের সঙ্গে মেশা চলবে না। বাগান আছে, তুমি বাগানে ঘোরো, ছাদ আছে, ছাদে কাঠের বল নিয়ে খেল। আমি যতক্ষণ আছি আমার সঙ্গে ঘোরো, খেলা করো। কিন্তু মিত্তিরদের বাড়ির ওই নোংরা কুকুর দেখে তোমার মাথা খারাপ করা চলবে না। ওরা আমাদের তিনপুরুষের শত্রু।

"এই যে মোহন," বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন। ফিরে দেখলুম, মোহন মেজমামার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে। "ফার্স্ট আমি ডেকেছি, তুই আগে আমার কাছে আসবি!"

মেজমামা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, "ফার্স্ট সেকেণ্ডের কী আছে রে। তুই আগে আমার ওষুধ তৈরি করে দিয়ে তারপর যেখানে যেতে হয় যাবি!"

বড়মামা বললেন, "বা হে বাঃ; খলে ঘষে ঘষে তোমার কবিরাজী ওষুধ তৈরি করে ও সকালটা কাটিয়ে দিক, এদিকে আমি বসে থাকি হাঁ করে। কুকুরের জন্য কিমা না আনলে ও দুপুরে খাবে কী, উপোস করে থাকবে!"

"কিমা! কুকুরের কিমা!" মেজমামা এমনভাবে হাসলেন যেন বড়মামা অদ্ভুত উদ্ভট কোনো কথা বলেছেন। তারপর বড়মামার চোখের সামনে আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন, "জানো না রাস্তায় সব গাড়ির আগে যায় অ্যামবুলেনস আর ফায়ার ব্রিগেড। এমার্জেন্সি, বুঝেছ, এমার্জেন্সি। যা মোহন, প্রথমে ঘষবি দারু হরিদ্রা, তাতে দিবি গোলঞ্চর জল, বড়িটাকে ১৫ মিনিট খলে ঘষবি মধু দিয়ে, তারপর সব এনে হাজির করবি আমার টেবিলে। চলো ভাগনে!"

আমি কিছু প্রতিবাদ করার আগে মেজমামা আমাকে প্রায় হাতে হাতকড়া লাগাবার মতো করে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন, "মূর্খ হয়ে থাকতে চাস। জানিস, পৃথিবীতে কত কী শেখার আছে! এক জীবনে মানুষ সব পারে না।" আমি বললুম, "তাই তো হাঁসের মতো দুধ আর জল থেকে শুধু জলটা তুলে নিতে চাই।"

"উল্টে গেল হে, উল্টে গেল," কথা বলতে-বলতে মেজমামা আলমারি খুলে একটা বুলওয়ার্কার বের করলেন, "বুঝেছ, যারা মাথার কাজ করে তাদের একটু করে ব্যায়াম করা উচিত।" মেজমামা জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বুলওয়ার্কার টানতে লাগলেন। যতটা না টানছেন তার চেয়ে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন।

একটা মোটর সাইকেল সশব্দে বাড়ির সীমানা থেকে উল্কার মতে বেরিয়ে গেল। বড়মামা এমনিই খুব জোরে চালান, আজ আবার রেগে আছেন। নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন দেড় মাইল দূরের বাজার

থেকে কিমা কেনার জন্যে। জাফরের দোকান ছাড়া মাংস কেনা চলবে না। তা না হলে কাছাকাছি আরও একটা দোকান ছিল।

দু'মামা আর এক মাসির কাণ্ডকারখানা চলেছে এ-বাড়িতে। বড়মামা ডাক্তার। মেজমামা প্রফেসর। মাসি সকালের স্কুলের টীচার। বাড়িতে গরু আছে, পাখি আছে, কুকুর আছে, বাগান আছে, একগাদা কাজের লোক আছে। মাঝেমাঝেই বড়মামা মেজমামার লড়াই আছে, গলায় গলায় ভাব আছে। নেই কেবল মামিমা। বুড়ি দিদিমা ছেলেদের ওপর রাগ করে কাশীবাসী।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল বড়মামা ফিরছেন না। স্নানের পর গায়ে পাউডার মাখতে মাখতে মেজমামা বললেন, "বাবা! বড়বাবু কি ব্যারাকপুর থেকে খিদিরপুর গেলেন কুকুরের কিমা কিনতে। কুকুর কুকুর করেই ডাক্তারবাবু কাবু হয়ে গেলেন। তুমিই বলো, ওষুধ আগে না কুকুর আগে।"

কী আর বলব, চুপ করে শুনছি। ছবির বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি, মাসি এসে গেলে তবু আর একদফা মুখরোচক খাবারদাবার জুটত।

মেজমামার জামাকাপড় পরা হয়ে গেল। জানলা দিয়ে উত্তরদিকে তাকিয়ে বললেন, "ভাবালে দেখছি। উঁহু ভাল ঠেকছে না হে। এতক্ষণ দেরি হবার তো কথা নয়। বাবু রেগেমেগে যেভাবে বেরিয়ে গেলেন। এসব রাস্তায় অত জোরে গাড়ি চালানো কি ঠিক! না ফিরলে বেরোতেও পারছি না। এদিকে প্রথম ক্লাসের সময় হয়ে এল। লঞ্চে করে গঙ্গা পেরোতেই তো আধঘণ্টা লেগে যাবে।

হঠাৎ দূরে মোটর বাইকের শব্দ হল। ভীষণ বেগে আসছে। আমরা জানলার কাছে সরে এলুম। মেজমামা বললেন, "মনে হচ্ছে বড়বাবু!" হ্যাঁ বড়মামাই। লাল ঝকঝকে মোটর সাইকেল। পরনে লাল লুঙ্গি। গায়ে গোলগলা গেরুয়া গেঞ্জি। উল্কার বেগে বড়মামা বাড়ির সামনে দিয়ে পশ্চিমে বেরিয়ে গেলেন। মাথার ঝাঁকড়া চুল হাওয়ায় উড়ছে নটরাজের জটার মতো। বড়মামার দশহাত পেছনে ব্যারাকপুরের বিখ্যাত ভোলা। সেও খ্যাড়াখ্যাট্ খ্যাড়াখ্যাট্ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ভোলা হল ইয়া তাগড়া এক ষাঁড়। বাজার অঞ্চলে, ভক্ত ভোলার সংখ্যা, কম নয়।

মেজমামা বললেন, "সেরেছে ! বড়বাবুকে দেখছি গঙ্গার জলে না ফেলে দেয়। একে ভোলা, তায় লাল মোটর বাইক, তার ওপর লাল লুঙ্গি, তার ওপর ওই পিলে-ফাটানো শব্দ। কে বাঁচাবে বড়বাবুকে!"

মেজমামা চিন্তিত মুখে, ঘর থেকে রাস্তার দিকের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। আমি পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। বলতে কী, দারুণ মজাই লাগছিল। রেসটা বেশ জমেছে ! বড়মামা হারেন, কি, ভোলা হারে ! রাস্তাটা সামনে গিয়ে গোল একটা প্যাঁচ মেরে আবার ফিরে এসেছে। বেশ জটিল ট্র্যাক। বড়মামা ঘুরে আসছেন, এবার বেগ আরও বেশি। ভোলার স্পীডও যেন বেড়ে গেছে। ভোলা ভীষণ রেগে গেছে, বড়মামাকে হারাতে পারছে না কিছুতেই।

বাড়ির সামনে দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে যেতে বড়মামা চিৎকার করে বললেন, "শান্তি, ষাঁড়টাকে কোনরকমে গ্যারেজ করে দে।"

মেজমামা চিন্তিত মুখে বললেন, "কী করে ষাঁড় গ্যারেজ করি বলো তো। ষাঁড় তো আর গাড়ি নয় !" দুজনে নেমে রাস্তার পাশে এলুম। কাজের লোকজন কাজ ফেলে এসেছে। মোহনের নানা প্ল্যান। সে একটা লাঠি এনেছে। ষাঁড়কে ল্যাঙ মেরে ফেলে দেবে। অতই সহজ। নিজেই ছিটকে পড়বে নর্দমায় ! মজা দেখার জন্যে আশপাশের বাড়ির জানলা দরজায় বড় ছোট মুখ। মিত্তিরদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি কিশোর হুইসিল বাজাচ্ছে।

বড়মামা ওদিককার গোল রাস্তা দিয়ে আবার এদিকে তীরবেগে আসছেন। পেছনে ল্যাজ তুলে ভোলা। এদিকে প্রথম রাস্তায় যাবার সময় বড়মামা বললেন, "একটা কিছু কর, তেল ফুরিয়ে আসছে। আর পারছি না।" বড়মামা আসতেই মিত্তিরদের বাড়ির ছেলেটা ফুরর ফুরর করে বাঁশি বাজাল। সমস্ত জমায়েত পাশে দাঁড়িয়ে হো হো করে উঠল।

পশ্চিমের দিক থেকে বড়মামা আবার আসছেন। বড়মামা বেশ ক্লান্ত, বিব্রত। বড়মামা বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর থেকে আমাদের পাশ দিয়ে তীরবেগে সাদা মতো কী একটা রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ল—বড়মামার কুকুর লাকি। ভয়ে আমরা চোখ

বুজে ফেলেছি। দু'গজ দূরে বিশাল ভোলা লাফাতে লাফাতে আসছে। লাকি একলাফে ভোলার মুখের ওপর লাফিয়ে উঠল। ভোলার চোখ চাপা পড়ে গেছে, লাকি নাক কামড়ে ধরেছে। ভোলা এক ঝটকা মেরে লাকিকে ফেলতে ফেলতেই বড়মামা ঘুরে এসেছেন, মোহন লাঠি বাগিয়ে তেড়ে গেছে। এইবার উল্টো রেস—ভোলা ছুটছে আগে, বড়মামা তাড়া করে পেছনে।

আমরা দৌড়ে গেলুম লাকির কাছে। একটা বাড়ির রকের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যে মেজমামা কুকুর দেখলে দশ হাত দূরে পালান, সেই মেজমামা কলেজে যাবার ধবধবে পোশাকে লাকিকে কোলে তুলে নিয়েছেন। চোখ দুটো ছলছলে। ভোলাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে, বড়মামা ফিরে এসে বাইকটাকে কোন রকমে ফেলে রেখে, ধরা গলায় লাকি লাকি করছেন। মাসিও এসে গেছেন।

দেখতে দেখতে বাড়ি হাসপাতাল। বড়মামার বন্ধু পশুচিকিৎসক ডাক্তার বরাট এসে গেছেন। দুই মামারই বারেবারে এক প্রশ্ন, "বাঁচবে তো বাঁচবে তো!" বরাট বলছেন, "বেশ একটু শক লেগেছে। সারতে সময় লাগবে কয়েক দিন। আমি ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেলুম।"

সন্ধেবেলা লাকি বড়মামার নরম বিছানায় পাখার তলায় ঘুমোচ্ছে। মাসি চিঁড়ে ভাজছেন। মেজমামা ইজিচেয়ারে বসে বিশাল মোটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। মুখটা খুব বিষণ্ণ। মাঝে-মাঝে পিট-পিট করে লাকির দিকে তাকাচ্ছেন। বড়মামা দুপুর থেকে লাকির পাশে সিস্টারের মতো বসে আছেন।

হঠাৎ বড়মামা বললেন, "বুঝলি শান্তি। রাগ চণ্ডাল!"

মেজমামা বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ। আমরা দুজনেই ভীষণ রাগী।"

বড়মামা বললেন, "বাবা ভীষণ রাগী ছিলেন।"

মেজমামা বললেন, "মা-ও তা-ই। বরং বেশিই ছিল।"

বড়মামা বললেন, "আসছে বার কুকুর হয়ে জন্মাব।"

মেজমামা বললেন, "আমিও। লাকিকে দেখে আজ আমার জ্ঞান হল।"

বড়মামা মেজমামার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "হাত মেলা।" দু'মামার করমর্দন, আর ঠিক সেই সময়ে সারাদিন পরে লাকি প্রথম দুবার শব্দ করল—ভুক, ভুক! সঙ্গে সঙ্গে দু'মামার উল্লাসের চিৎকার, 'লাকি, লাকি।" লাকি বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠে ডাক ছাড়ল, "ভৌ, ঔ।"

চার

মেজমামা অষ্টাবক্র মুনির মতো কাতরাতে কাতরাতে বড়মামার ঘরে এসে ঢুকলেন। ডান হাতটা কোমরে। পরনে কালো শর্টস, স্যাণ্ডো গেঞ্জি। গলার কাছে একটা সোনার পদক ঝুলছে। চোখে চশমা নেই তাই মুখটা একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে।

বড়মামা সকাল থেকেই আজ ভীষণ ব্যস্ত। বড়মামার কুকুর লাকি নাকি রোগা হয়ে যাচ্ছে। গায়ে বুরুশ দিলেই গাদা গাদা লোম উঠে আসছে। সাতদিন আগেও বড়মামাকে দেখলে যে-ভাবে যত ঘনঘন পটাক পটাক ন্যাজ নাড়ত ইদানীং তত জোরে আর নাড়ছে না। নাড়ছে, তবে দেয়ালঘড়ির পেন্ডুলামের মতো ধীরে ধীরে, একবার এদিকে একবার ওদিকে। ডাকেরও আর তেমন ঝাঁঝ নেই। মিইয়ে মিইয়ে ডাকে। সব সময় হাত-পা ছাড়িয়ে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে থাকে।

সেই কুকুরের জন্যে সুষম খাদ্য তৈরিতে বড়মামা ব্যস্ত। সামনে একটা বড় বই খোলা। বারে বারে পাতা উল্‌টে যাচ্ছে বলে আমার ওপর হুকুম হয়েছে. "ধরে থাক। বই আর ছাত্র দু'পক্ষই সমান চঞ্চল। শুধু ছাত্রদের দোষ দিলেই তো হবে না. বইয়ের স্বভাবটাও তো দেখতে হবে। তখন থেকে খোলা রাখার চেষ্টা করছি। চশমার খাপ. পেপার ওয়েটমোয়েট কোনো কিছু দিয়েই জব্দ করা যাচ্ছে না। স্বভাব যাবে কোথায়? পাতায় পাতায় এত জ্ঞান ঠাসা, স্বভাবে নির্বোধ। ঝপাত করে বন্ধ হয়ে গেলেই হল।"

একটু আগেই বইয়ের সঙ্গে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে। বইটার মাঝামাঝি একটা জায়গা খুলে বড়মামা একপাশে চাপা দিয়েছিলেন চশমার খাপ আর একপাশে একখণ্ড চৌকো কাঠ।

আমি বসেছিলুম জানলায় পা তুলে। হাতে টিনটিন। মেজমামা কালই এনে দিয়েছেন। কোমর দুরমুশ করে দেবার পুরস্কার। হঠাৎ হুম্মার দুড়দুড় শব্দ। কাঠের টুকরো, চশমার ভারী খাপ দুটোই মেঝেতে। পাশাপাশি চিৎপাত। পরক্ষণেই বইটাও মেঝেতে। বড়মামার দাঁত কিড়মিড় করছে, "রাসকেল, থার্ডগ্রেড ইডিয়েট। আমি দেখছি, দেখে যাচ্ছি।"

বড়মামা বইটাকে মেঝেতে ফেলে জায়গা মতো খুললেন। তারপর সেই খোলা বইয়ের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসেই বললেন, "যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। লাইক ডগ, লাইক ক্লাব।"

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মন্তব্য করলেন, "রাসকেল শব্দটা গালাগাল নয়। তুমি আবার মেজকে গিয়ে যেন বোলো না, বড়মামা সবসময় গালাগাল দেন।"

বইটার ওপর ওভাবে বসলেন?"

"ওর মেরুদণ্ড ভেঙে না দিলে কাজ করা যাবে না। মানুষের মতো জ্বালাতনে স্বভাব হয়েছে। উনি খোলা থাকতে চান না, বন্ধই থাকবেন। এই যা ব্যবস্থা হল, এখন সারাজীবন খোলাই থাকবে, বন্ধ আর হবে না।"

মোটা রেকসিন বাঁধাই 'ডগ ম্যানুয়েল'। পাতায় পাতায় পৃথিবীর যাবতীয় কুকুরের ছবি। বড়মামার ভারে সামান্য দমে গেলেও মেরুদণ্ডের জোর এখনও বেশ প্রবল। বইটার ওপর আরও অত্যাচারের প্ল্যান হচ্ছিল। মমতা পড়ে যাওয়ায় ছুটে এসে ধরে আছি।

টেবিলের কাঁচের ওপর নানারকম ট্যাবলেট ফেলে শিশির পেছন দিয়ে বড়মামা গুঁড়ো করছেন। কাজে এতই ব্যস্ত, মেজমামা এসেছেন লক্ষ্যই করেননি।

মেজমামা কাতরাতে কাতরাতে বললেন, "কোমরটা আর সোজা করতে পারছি না।"

"সারা জীবন বেঁকে বসলে সোজা হবে কী করে? বেঁকেই থাকবে।" মুখ না তুলেই উত্তর দিলেন বড়মামা।

"আহা, সোজা করতে গিয়েই তো বেঁকে গেল।"

"অ্যাঁ, সে আবার কী? কুকুরের ন্যাজ নাকি? সোজা করা যায়

না ?" বড়মামা এইবার চোখ তুলে তাকালেন। তাকাতেই হল।

"কোমর সোজা করা যায় না মানে ? এই দ্যাখ আমার কোমর। সোজা করছি, বাঁকা করছি।" বড়মামা চেয়ারে বসে বসেই মেজমামাকে কোমর বাঁকানো আর সোজা করার খেলা দেখাতে লাগলেন।

মেজমামার ডান হাতটা কোমরে। শরীরটা সামনে বেঁকে ধনুক। চেষ্টা করেও সোজা হতে পারছেন না। মুখ দেখে মনে হয় যন্ত্রণাও হচ্ছে। সেই অবস্থায় বললেন, "তোমার কোমর আর আমার কোমরে অনেক তফাত।"

বড়মামা সামনের দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছিলেন, সোজা হয়ে গেলেন, "তার মানে ? কিসের তফাত ? তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ। তুমি কি নিজেকে অতিমানব ভাব নাকি ? ও তোমার হল গিয়ে শৌখিন কোমর আর আমার হল গিয়ে মেহনতি কোমর।"

মেজমামা প্রতিবাদ করে উঠলেন, "সব কথাকেই তুমি বড় বাঁকা করে নাও, বড়দা। তোমার কপালে ভিটামিন বি কমপ্লেকসের গুঁড়ো।"

বড়মামা কপালে হাত দিলেন। মেজমামা থামেননি, "আমার কথা শেষ হবার আগেই তুমি ক্যাঁট-ক্যাঁট করে কথা শোনাতে লাগলে। আমি বলতে চাই, তোমার শরীরটা চিরকালই তো ভাল। ব্যায়াম-ট্যায়াম কর। আসন কর। আমার তো সে-সব নেই। কোমরটাকে না খেলিয়ে নষ্ট করে ফেলেছি।"

মেজমামার কথায় বড়মামা যেন খুশিই হলেন। প্রশ্ন করলেন, "খেলাওনি কেন ? পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান তোমার মাথায়, এই জ্ঞানটাই নেই, দরজার কব্জাকে যেমন খেলাতে হয় তেমনি শরীরের কব্জাকেও সচল রাখতে হয়।"

"আহা ! এতদিন পরে সেই জ্ঞানটাই তো হয়েছিল। ক'দিন থেকে কনকন করছে, কনকন করছে, সকালে উঠে ভাবলুম, মাথার উপর হাত তুলে কানের পাশে চেপে ধরে হাঁটু না ভেঙে সামনে ঝুঁকি, ঝুঁকে পায়ের পাতা ছুঁই। হাঁটুটা একটু বাঁকলেও মোটামুটি হল, তারপর যেই সোজা হতে গেলুম, খটাক করে একটা শব্দ হল, আর আমি এইরকম হয়ে গেলুম।" মেজমামার মুখ কাঁদোকাঁদো।

অন্যের দুঃখে বড়মামা সবসময়েই কাতর। উঠে দাঁড়ালেন। মেজমামাকে বললেন, "আয়, ঘরের মাঝখানে সরে আয়। ওষুধে কাজ হবে না। ফিজিওথেরাপি করতে হবে।"

মেজমামা একপাশে চেত্তা খেতে খেতে ঘরের মাঝখানে সরে গেলেন। মেজমামার বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা দেখে আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। হাসি চাপবার কুঁক-কুঁক শব্দ হল কয়েকবার। ভীষণ অসভ্যতা। কী করব, চাপতে পারছি না।

বড়মামা মেজমামার কোমরে আস্তে আস্তে দুবার চাপড় মারলেন, "অ্যাঃ, একেবারে দরকচা মেরে গেছে। রেগুলার একে তেল খাওয়াতে হবে। জং ধরে গেছে।" দু'হাত পিছিয়ে এসে দেয়ালে ছবি টাঙাবার সময় যেভাবে বাঁকা সোজা দেখে, বড়মামা সেইভাবে মেজমামাকে দেখতে লাগলেন। "মনে রাখ, ফর্টি ডিগ্রী নর্থ, টেন ডিগ্রী ওয়েস্ট, জিরো ডিগ্রী ইস্ট।"

বড়মামার কথা শুনে মেজমামা বললেন, "তুমি যেন জাহজ চালাচ্ছ?"

"এইবার বুঝবি কেন বাউলরা বলে দেহতরী। প্রথমে তোকে ঠেলে উত্তরদিকে চল্লিশ ডিগ্রী তুলব, তারপর দু'কাঁধ ধরে পশ্চিমে ১০ ডিগ্রী মুচড়ে দেব, পুবে কিছু করতে হবে না। ব্যস, আবার তুই সোজা প্রফেসার হয়ে যাবি।"

বড়মামা কুস্তিগিরের মতো হাতের তালুতে তালু ঘষলেন। মেজমামা ভয়ে ভয়ে বললেন, "এটা তো তোমার আসুরিক চিকিৎসা হয়ে গেল দাদা। ভীষণ লাগবে। এমন কী চিরকালের মতো আমার কোমরটা কব্জা-ভাঙা দরজার মতো ঢকঢকে হয়ে যাবে।"

"অ্যানাটমির তুমি কী বোঝ হে! মেরুদণ্ডের শেষটা কীরকম তুই জানিস? কটা হাড় আছে তুই জানিস? ওই জায়গাটায় হিঞ্জ সিসটেম, তুই জানিস?"

কথা বলতে বলতে বড়মামা মেজমামার দিকে এগোচ্ছেন। মেজমামা একটু একটু করে পেছোচ্ছেন। বড়মামা বলছেন, "তুই ভাবছিস সামনের দিক থেকে তোকে মারব? মোটেই না। পেছন দিক থেকে একটা হাত চালিয়ে দেব তোর গলার ওপর দিয়ে

আড়াআড়ি। কব্জিটাকে লাগিয়ে দেব গলা আর দাড়ির মাঝখানের খাঁজে, তারপর পেছন দিকে মারব টান।"

মেজমামার মুখ দেখে মনে হল পালাতে চাইছেন। ক্রমশ দরজার দিকে পেছোচ্ছেন। বড়মামা ধরতে পেরেছেন, "তুই সরে-সরে দরজার দিকে যাচ্ছিস কেন? পালাবার মতলব?"

মেজমামা বললেন, "তোমার হাবভাব আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না, দাদা। যেভাবে ব্ল্যাকপ্ল্যান্থারের মতো গুটি-গুটি এগিয়ে আসছ! আমার ভয় লাগছে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। নিজে নিজেই ঠিক করে নোব।"

"তার মানে? অবিশ্বাস? আমাকে হাতুড়ে ভাবছিস? ভাবছিস শরীরতত্ত্বের কিছুই জানি না?"

"আহা, তা ভাবব কেন? এই গ্রামে তোমার মতো অ্যালোপ্যাথ আর কে আছে? আসলে অ্যালোপ্যাথিতে আমার আর তেমন বিশ্বাস, না না, বিশ্বাস নয়, উৎসাহ নেই। আমি হোমিওপ্যাথি করাতে চাই।"

"ধ্যার, আমি কি তোকে অ্যালোপ্যাথি করছি নাকি? ফিজিও-থেরাপিতে সবে যে ট্রেনিং নিয়ে এলুম গত তিনমাস ধরে, তারই প্রথম প্রয়োগ হবে তোর ওপর। এরকম একটা কেস এত সহজে ঘরে বসেই পেয়ে যাব ভাবিনি।"

"দাদা, তোমার পায়ে পড়ছি। বিশ্বাস করো, আমি প্রায় সোজা হয়ে গেছি। তাকিয়ে দ্যাখো। আগের চেয়ে সোজা-সোজা লাগছে না?" মেজমামা জোর করে একটু সোজা মতো হতে গিয়ে 'আউ' করে চিৎকার করে উঠলেন।

বড়মামা শব্দ করে হেসে বললেন, "আমার হাত না পড়লে তুই মেরামত হবি না রে মেজ!"

বড়মামা দরজা আটকে ফেলেছেন, "চল, চল, ঘরের মাঝখানে একটু স্থির হয়ে দাঁড়া। তুই তো জানিস একসময় আমি কুস্তি করতুম। তুই যত চলে চলে বেড়াবি আমি আর তোকে রুগি ভাবতে না পেরে প্রতিপক্ষ ভেবে হঠাৎ একটা আড়াই-প্যাঁচ মেরে দোব, তখন মাস তিনেক আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবি না।"

বড়মামার খাটের তলায় এক টুকরো কার্পেটের ওপর লাকি হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিল। শরীর ভাল না। সারাদিন শুয়েই থাকে। পেছন দিকের অল্প একটু অংশ ন্যাজ সমেত খাটের বাইরে বেরিয়ে আছে। বড়মামাকে সত্যিই এবার কিং কংয়ের মতো মনে হচ্ছে। যেমন করেই হোক মেজমামাকে ধরে পেছন দিকে মটকে দেবেন। মেজমামা বেকায়দা। খাটের দিকে পিছু হটছেন।

আমি জানতুম এইরকম ঘটনাই ঘটবে। লাকির বেরিয়ে থাকা ন্যাজে মেজমামার পদপাত। অনেকদিন পরে লাকি লাফিয়ে উঠল। সেই পুরনো ঝাঁঝ, সেই পুরনো চিৎকার। ঘাউ ঘাউ করে লাফিয়ে উঠেছে। খাটে মাথা ঠুকে কেঁউ কেঁউ। মেজমামার ভীষণ কুকুর-ভীতি। আচমকা লাকির চিৎকারে অনায়াসেই সোজা হয়ে গেছেন। কোমরের খটকা নিজেরই চমকানিতে খুলে গেছে।

বড়মামা টেবিল থেকে লাকির সুষম খাদ্য তৈরির সমস্ত মালমশলা সরাতে সরাতে বললেন, "বুঝলি ডাক্তারের কুকুরও ডাক্তার হয়। আমাকে হাত দিতেই হল না। আমার অ্যাসিসটেণ্টই এক চিৎকারে তোর মেজমামাকে মেরামত করে দিলে!"

আমি বললুম, "মেজমামার পা যেন রামচন্দ্রের পা। লাকির ন্যাজে পড়তেই অহল্যা উদ্ধারের মতো চাঙ্গা হয়ে উঠল। সেই থেকে কীরকম চেল্লাচ্ছে দেখেছেন। সেই পুরনো মেজাজ।"

কথাটা বড়মামার তেমন পছন্দ হল বলে মনে হল না।

পাঁচ

বিরাট প্রদর্শনী ফুটবল খেলা। কলকাতার টিম আসছে আমাদের পাড়ার টিমের সঙ্গে খেলতে। বাঘাদা আমাদের ক্যাপটেন। খেলার মাঠের পশ্চিম পাশে বড়োমামার বাগানের নড়বড়ে পাঁচিল। ইটের খাঁজ থেকে মশলা ঝরে পড়েছে। নোনা ধরে গেছে। ইটের চাপে ইট দাঁড়িয়ে আছে। মাঝেমধ্যে সাপের খোলস ঝুলে থাকে।

এত বড়ো একটা খেলা! বড়োমামা না দেখে পারেন! তায় আবার রবিবারের বিকেল। স্টেথিসকোপের এক বেলা ছুটি। দেয়ালের গায়ে সাপের মতো ঝুলছে। সোমবার সকালে নেমে আসবে বড়োমামার গলায়। সিল্কের লাল লুঙ্গি। ট্যাকে নস্যির ডিবে। গায়ে গোল গলা, বোতাম লাগানো, হাতাঅলা, ধবধবে সাদা গেঞ্জি। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। পাড়ার দলের প্রধান সাপোর্টার হয়ে বড়োমামা গোল লাইনের পেছনে। বড়োমামার পেছনে আরো এক দল। আর এক দল উঠে বসে আছে বড়োমামার পাঁচিলে। বড়োমামা একবার একটু খুঁতুর খুঁতুর করেছিলেন। তবে এত বড়ো একটা খেলা। তা ছাড়া পাঁচিলে চেপেছে আমাদেরই দলের সাপোর্টাররা।

আমাদের টিম খেলছে ভালো। তার চেয়েও ভালো আমাদের চিৎকার। মাঝমাঠ থেকে বল ওদের সীমানায় ঢুকেছে কি ঢোকে নি, অমনি আমাদের গগনভেদী চিৎকার—গোল, গোল। খেলা ড্র যাচ্ছে। শেষ হাফে আমাদের ফরোয়ার্ড লাইনের বাঘাদা বাঘের মতো বল নিয়ে, ও-দলের সব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তছনছ করে গোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বড়োমামার নস্যির টিপ হাতের আঙ্গুলে। নাকের কাছে উঠছে আবার নেমে নেমে যাচ্ছে। চিৎকার করছেন, ডু অর ডাই। বাঘা, ডু অর ডাই। বাঘাদার প্রথম শট গোলকীপার ফিরিয়ে দিয়েছে। বল নিয়ে ধস্তাধস্তি চলেছে! সাপোর্টাররা সামনে পেছনে দুলছে। গলা থেকে গোল শব্দটা গোল না হওয়া পর্যন্ত বেরোবে না। সকলেই চেঁচাচ্ছে—গোও, গোও। ওল আর হয় না। হবে কি করে? গোলের মুখে যে গুলতানি শুরু হয়েছে।

গোল হোক না হোক, এই উত্তেজনায় বড়োমামার বাগানের সেই মান্ধাতার আমলের পাঁচিল কোল্যাপ্‌স্‌ করল। হই-হই, রই-রই ব্যাপার। ইট চাপা পড়েও সাপোর্টাররা গোও গোও করছে। ওল আর হল না। খেলা ড্র-ই রয়ে গেল।

সকালে বড়োমামা মিস্ত্রী ধরে আনলেন। রাস্তা আর বাগান এক হয়ে গেছে। নতুন পাঁচিল তো তুলতেই হবে। তা না হলে ওই সাপোর্টাররাই বাগান সাফ্‌ করে দেবে। ইট এসেছে, বালি এসেছে,

সিমেন্ট এসেছে। বড়োমামার মিস্ত্রী রহমতুল্লা এসেছে, সঙ্গে দু'জন মজুর। রহমতুল্লা একটা উঁচু ঢিবিতে উবু হয়ে বসে বিড়ি খাচ্ছে আর জোগাড়ে দুজনের সঙ্গে খুব গল্প করছে। বকরিইদের সময় খিদিরপুর থেকে পাঁঠা কিনবে।

খ্যাঁটের গল্প।

দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে বড়োমামা বললেন, 'বড্ড ফাঁকি হয়ে যাচ্ছে! নটা বেজে গেছে রহমতুল্লা।'

রহমতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে, 'হচ্ছে বাবু হচ্ছে। বেশি টিকটিক করবেন না। কাজ ভালো হবে না।'

'তাই নাকি রে ব্যাটা?'

'ব্যাটা, ব্যাটা করবেন না।'

'মেজাজ দেখাচ্ছিস?'

'মেজাজ আপনিই দেখাচ্ছেন।'

'আমি দেখাচ্ছি? না তুই দেখাচ্ছিস ব্যাটা?'

'আবার ব্যাটা বলছেন?'

'ব্যাটার মানে জানিস? ব্যাটা ভূত!'

'আবার ভূত বলছেন?'

'ভূতকে ভূত বলব, না তো কি মানুষ বলব!'

বেশ মজা লাগছে। দু'জনে কেমন তরজা চলছে। বড়োমামার পাশে মেজোমামা এসে দাঁড়িয়েছেন। গোলমাল, হই-হই মেজোমামা একদম সহ্য করতে পারেন না। কারুর ছেলে কাঁদলে দৌড়ে গিয়ে বলেন, এই নে বাবা পাঁচটা টাকা, ওকে থামা। সেই মজাতেই আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে, সে বেশ পেয়ে বসেছে। গেণ্ডিপেণ্ডি গোটা তিনেককে নিয়ে আসে সাত সকালে। এসেই পেটাতে থাকে। মেজমামা থাকলে পিটুনি বেড়ে যায়। টাকার লোভে। মাসীমা দেখেশুনে বলেন, পৃথিবীটা শয়তানে ভরে উঠেছে।

মেজোমামা বড়োমামাকে বলছেন, 'কাজ করাবে কাজ করাও, তুমি ওকে ভূতপ্রেত বলছ কেন?'

'প্রথমে আমি ব্যাটা বলেছি, 'ব্যাটা' খারাপ শব্দ? তুই-ই বল-না।

ব্যাটা মানে ছেলে। আর ভূত? ভূত তো আদর করে বলে।'

'তোমার অত বকবক, খবরদারির কী দরকার? জানই তো, ওর মাথায় একটু ছিট আছে।'

রহমতুল্লা শুনতে পেয়েছে নিচে থেকে, চিৎকার করে বললে, 'ছিট আমার মাথায় না তোমাদের মাথায়?'

মরেছে, আপনি থেকে তুমিতে নেমেছে। বড়োমামা জানালার পাশ থেকে হুড়মুড় করে মেজোমামাকে একপাশে কাত করে দিয়ে ভেতর দিকে সরে গেলেন। আমরা সব দেখতে পাচ্ছি নিচে থেকে। দাঁড়া। জানালা থেকে সরে যাওয়া মানেই বড়োমামা নিচে নামছেন। ঠিক তাই। প্রায় ছুটতে ছুটতে বাগানে প্রবেশ।

'অ্যাই তোকে কাজ করতে হবে না। নিকালো, আভি নিকালো।'

'নিকালো বললেই নিকালো। নটা বেজে গেছে, এখন আমরা নতুন কাজ ধরতে পারব?'

'দ্যাটস নট মাই লুক আউট।'

'আমরা যাব না, এ বাড়িতে আমরা বড়োবাবুর আমল থেকে কাজ করছি, হু আর ইউ!'

'উরে ব্বাবা ইঞ্জিরি বলছিস?'

'আমরাও কইতে পারি জনাব।'

'তুমি আমার ইটে হাত দেবে না।'

'জরুর দোব। আতা মশলা মাখ।'

'মজুরী দোব না।'

'চাই না।'

আতা হোসেন বালি মাপছে, রামভরোসা সিমেন্টের বস্তা খুলছে। বড়োমামার মুখ দেখে মায়া হচ্ছে। তবু শেষ প্রতিবাদ, 'তুমি আমার পাঁচিল গাঁথবে না, আমি তোমাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি।'

'যান, যান, নিজের কাজে যান। বাইরের ঘরে অনেক রুগী জমেছে। নিজের চরকায় তেল দিন। অয়েল ইওর ওন মেশিন।'

'তুই গেঁথে দেখ, আমি রন্দা মেরে-ফ্ল্যাট করে দোব।'

'বড়োবাবুর আমলের লোক, তুই বলতে তোমার লজ্জা করছে না?'

'আমি বামাখ্যাপার চেলা। আমি সব্বাইকে তুই বলি। আমার শ্যামা মাকেও তুই বলি রে পাঁঠা।'

'বেশ কর। তুমি এখন যাও। ডিসটার্ব কোরো না।'

'আমার এক কথা, তুমি আমার পাঁচিলে হাত দেবে না।'

'হ্যাঁ, পাঁচিলই নেই তো পাঁচিলে হাত দেবে না। রামছাগলের মতো কথা।'

'আমি রামছাগল?'

'আমি পাঁঠা হলে তুমি তাই। আমি মানুষ হলে তুমি তাই। রামভরোসে মাখা লে আও।'

খপাস খপাস করে দু'কড়া মাখা মশলা পাঁচিলের কাছে পড়ল। 'আতা, ইটে পানি ঢাল।'

বড়োমামা বললেন, 'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু! আমার কাজ আমি তোমাকে দিয়ে করাব না। ভদ্রলোকের এক কথা।'

কর্ণিকে এক খাবলা মশলা তুলে সেই ডাঁটিয়াল মিস্ত্রী ইটের ওপর থপাস করে ফেলে, একটু নেড়েচেড়ে একটা ইট বসিয়ে কর্ণিকের পেছনের বাঁট দিয়ে, ঠুকুস ঠুকুস করে ঠুকে দিল! বড়োমামা দু'হাত পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গা-জোয়ারী হয়ে যাচ্ছে রহমত।'

'জোর যার মুলুক তার।'

তিনটে ইট গাঁথা হয়ে গেল। বড়োমামা একেবারে হেল্‌পলেস। জোগাড়েরা ঘিরে রেখেছে রাজকে! এমনভাবে জল ঢালছে, মশলা ফেলছে, বড়োমামার পায়ে ছিটকে ছিটকে লাগছে। কিছু করার নেই, কাজ ইজ কাজ। রহমতুল্লা ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে সরে সরে যাচ্ছে, ইট গাঁথতে গাঁথতে। বড়োমামা এমন মানুষের পেছনে কেন যে লাগতে গিয়েছিল? কাজের স্পিড কি যেন মেশিন! কিন্তু বড়োমামা যে এমন তক্কে তক্কে ছিলেন আমরা কেউই বুঝি নি। রহমতুল্লা যেই পাঁচিলের ওকোণে সরে গেছে, বড়োমামা সদ্য গাঁথা ইটের সারিতে মারলেন এক লাথি। বাস্, গোটাকতক ইট সরে গিয়ে ত্রিভঙ্গ মুরারী।

রহমতুল্লা ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, 'কবার ভাঙবে? আমি আবার গাঁথব। দেখি তুমি হার কি আমি হারি!'

'দেখা যাক।' বড়মামারও রোখ চেপে গেছে। রোদ ক্রমশ চড়ছে। বেলা বাড়ছে হু হু ক'রে। রহমত গেঁথে চলেছে, বড়োমামা ভেঙে চলেছেন। জবরদস্ত খেলা! বড়োমামার রুগীরা চেম্বার ছেড়ে বাগানে চলে এসেছেন। এঁরা সব ডাক্তারবাবুর সাপোর্টার! ওপাশে রাস্তায় এক দল তারা মিস্ত্রীর সাপোর্টার। বড়োমামা যেই ভাঙেন, এরা হই-হই করে। রহমত যেই আবার গাঁথে ওরা হই-হই করে।

মেজমামা দর্শনশাস্ত্রে বুঁদ হয়ে চিলেকোঠায় বসেছিলেন। মাসীমা রান্নার কলেজে ভর্তি হয়েছেন। নোট বই খুলে চচ্চড়ি রাঁধছিলেন। দু'জনকেই ঘটনাটা জানালুম। মেজোমামা উদাস গলায় বললেন, 'ভাঙচে? ভেঙে ফেলছে? ও তোমার দেখার ভুল। কেউ ভাঙতে পারে না, গড়তেও পারে না। ব্রহ্ম স্ট্যাটিক। স্থির জ্যোতিপুঞ্জ।' মাসীমা ওপরে চলে এসেছেন।

'মেজদা, তুমি থাকতে সকলের সামনে বড়দা এই রকম ছেলে-মানুষি করে বংশের মুখ ডোবাবে?'

'আমাকে কি করতে বলিস?'

'তুমি বড়দাকে থামাও। ইটে লাথি মেরে পাটা যে যাবে।'

'চল, তা হলে।'

বড়োমামা লাথি মারবেন বলে সবে ডান পাটা তুলছেন, মাসীমা মেজমামা খপাত করে পেছন দিক থেকে আচমকা বড়োমামাকে জড়িয়ে ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে বাড়ির দিকে নিয়ে চললেন। রাস্তায় রহমতুল্লার সাপোর্টারদের তখন সে কী ভয়ংকর চিৎকার—হিপ হিপ হুররে! হিপ হিপ হুররে!

ছয়

বড়মামার ডাক্তারি এবার মাথায় উঠবে। রুগিরা ভীষণ অসন্তুষ্ট। যাঁর পর পর তিনটে ইঞ্জেকশান পড়ার কথা তিনি একটা নিয়ে দিনের পর দিন আসছেন আর ফিরে ফিরে যাচ্ছেন। চেম্বারে ডাক্তারবাবু

নেই। সেদিন একজন স্পষ্টই বললেন, কুলপুরোহিত আর পরিবারের ডাক্তারকে যদি সময়মতো পাওয়া না যায় তাহলে অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবতেই হয়।

মেজমামা বললেন, "অ্যাদ্দিন ছিল ডাকসাইটে ডাক্তার, শেষ বয়েসে হয়ে গেল জেলে। কার বরাতে কখন কী যে হয়ে যায়! তাও যদি দু-একটা মাছের মুড়ো পাতে দেখা যেত! এমন নিরামিষ বৈষ্ণব জেলে খুব কমই দেখা যায়!"

যে যাই বলুন, আমার ভীষণ মজা। দিন বেশ কাটছে। বড়মামাকে ওই জন্যই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। যখন যা মাথায় ঢোকে তখন তাই করে ফেলেন। কারুর পরোয়া করেন না। ঠিক আমার মতো। লাট্টু ঘোরাব তো সারাদিন লাট্টুই ঘোরাব। অঙ্কে গোল্লা। দুটো দিক তো একসঙ্গে সামলানো যায় না। সেবার গুলিতে পেয়েছিল। ইতিহাসে কোনোরকমে টায়ে-টোয়ে তিরিশ। মেজমামা রেজাল্ট্ দেখে ধেই-ধেই করে নাচতে লাগলেন। বড়মামা বললেন, "ব্যাটা আমার সাচ্চা ভাগনে।"

এবারের পরীক্ষায় কী হবে মা সরস্বতীই জানেন! বড়মামা যেভাবে নাচাচ্ছেন, আমি কী করব! গুরুজনের কথা কি অমান্য করা চলে! সকলে বলবে, বড় অবাধ্য! উঠোনের এক পাশে মামা-ভাগনে থেবড়ে বসে আছি। ভীষণ কেরামতি চলেছে। দু'পাউন্ড রুটি পিঁপড়ের ডিম দিয়ে চটকানো হয়ে গেছে। বিশু রান্নাঘরে কুঁড়ো আর খোল ভাজছে। গন্ধে বাড়ি ম-ম করছে। এক বোতল তাড়ি ভীষণ অসুবিধেয় ফেলেছে। গন্ধটা তেমন-সুবিধের নয়। নারকেলের মালায় কেঁচো কিলবিল করছে। আস্ত একটা বোলতার চাক ডিমসুদ্ধ খবরের কাগজে শুয়ে আছে। কাগজটা মনে হয় আজকের। কারণ মেজমামা অনেকক্ষণ দোতলায় 'কাগজ কাগজ' করে অস্থির হচ্ছেন। মেজাজ ক্রমশই চড়ছে। মাসিমা শান্ত করার চেষ্টা করছেন; বলছেন, "আজকাল কাগজ দিতে খুব দেরি করে। লোডশেডিং হয় তো।"

বড়মামা বললেন, "আমার নাকে রুমালটা বেঁধে দে তো, তাড়ি ঢালব।"

বিশুদার কুঁড়োভাজা এসে গেছে। গন্ধে আমার জিভেই জল এসে যাচ্ছে, মাছের যে আজ কী অবস্থা হবে! মেজমামা ঠিকই বলেন, ডাক্তারের ভিটামিনযুক্ত টোপ খেয়ে মাছেরা স্বাস্থ্যবান হচ্ছে, এরপর ডাক্তারকে আর মাছ ধরতে হবে না, মাছেরাই ডাক্তার ধরবে।

তাড়িপর্ব শেষ হল। বিশুদা বাইরে থেকে এসে বললেন, "একজন রুগি খুব হম্বিতম্বি করছেন, বলছেন, স্ত্রী মরোমরো, না গেলে ঠেঙাবেন।"

বড়মামা বললেন, "ঠেঙাবেন কী রে?"

"হ্যাঁ বাবু, ঠেঙাতেও পারে। আজকাল রুগিরা ডাক্তারদের কথায় কথায় দ্যাখ-মার করছে।"

"কী হবে বিশে! আমার তো আর দেরি করা চলে না। তুই বরং এক কাজ কর, আমার জামার বুকপকেট থেকে দশটা টাকা নিয়ে ওকে দিয়ে বল, ভোলা ডাক্তারকে ধরে নিয়ে যেতে। আমার হার্ট-অ্যাটাক হয়েছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমার কী হয়েছে বিশু?"

"আজ্ঞে হার্ট অ্যাটাচ।"

"গর্দভ, অ্যাটাচ নয়, অ্যাটাক।"

বিশু চলে যেতেই বড়মামা বললেন, "নে নে, তৈরি হয়ে নে। মাছের খাবার তো হল, এবার আমাদের সারাদিনের ব্যবস্থা। কুসি, কুসি।"

বড়মামা মাসিমার খোঁজে ভেতরে চলে গেলেন।

নটার সাইরেন বাজতে না বাজতেই আমাদের যাত্রা শুরু হল।

বড়মামার মাথায় শোলার টুপি। কাঁধে বিলিতি ছিপ। সে ছিপ আবার ইচ্ছেমতো বড় ছোট করা যায়। মোটরবাইকে যাওয়া চলবে না। শব্দে রুগিরা টের পেয়ে যাবেন। ডাক্তার বেশ ভালই আছেন। সাইকেলই আমাদের বাহন। নিঃশব্দে পাড়া ছেড়ে একবার বড় রাস্তায় পড়তে পারলে আমাদের আর পায় কে! বড়মামার সাইকেল চালানোর ভঙ্গি দেখলে মনে হবে, আমরা যেন কুখ্যাত আলকাট্রাজ জেল ভেঙে পলাতক দুই আসামী।

পুকুর না বলে দিঘি বলাই ভাল। বলা নেই কওয়া নেই বড়মামা ইজারা নিয়ে বসে আছেন। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে বেওয়ারিশ পড়ে আছে। পাঁচিল-টাচিল দিয়ে কোনও দিনই ঘেরা যাবে না, এত বিশাল ব্যাপার। চারপাশে গাছপালা আছে। আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, তাল, খেজুর, সুপারি। মেজমামা বলেছিলেন, "জমা নিচ্ছ নাও, তবে মাছ আর আমাদের চোখে দেখতে হবে না, পাবলিকেই ফাঁক করে দেবে!"

বড়মামা বলেছিলেন, "নিজের জন্যে তো অনেকদিন বাঁচা গেল, এবার না-হয় পরের জন্যে কিছুদিন বাঁচি।

সাইকেল থেকে জিনিসপত্র নেমে এল। শতরঞ্জি, জলের ফ্লাস্ক, মাছের খাবার, আমাদের খাবার, এক জোড়া ছিপ, জল থেকে মাছ তোলার জাল একটা রঙবেরঙের ছাতা, মোটা একটা লাঠি। একতাল দড়ি।

আমরা যে-জায়গায় বসব সেই জায়গায় লাঠি পুঁতে ছাতাটাকে বেশ করে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। একটু ছায়া চাই। চারপাশে রোদ খাঁ-খাঁ করছে। ভিজে-ভিজে ঘাসের ওপর ডোরাকাটা শতরঞ্জি পড়ল। চারে মাছ না এলেও চোখে ঘুম এসে যাবে। কাল তাই হয়েছিল, একপাশে বড়মামা, আর একপাশে ভাগনে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তেঠেঙার ওপর ছিপও ঘুমোচ্ছে। স্থির ফাতনার ওপর ফড়িং ঝিমোচ্ছে। মাছেদেরও সেই এক অবস্থা, তাড়ি-চটকানো চার খেয়ে বেহুঁশ শুয়ে রইল দিঘির তলায় পাঁকের বিছানায়।

বড়মামা বললেন, "নে, চার কর। আমি একটু চা খেয়ে নি। প্রকৃতি যেন হাসছে রে, প্রকৃতি যেন খিলখিল করে হাসছে। কাল থেকে একটা তাকিয়া আনতে হবে।"

"সাইকেলে কি আর তাকিয়া আনা যাবে?"

"খুব যাবে। চীন দেশে সাইকেলে সংসার বয়ে বেড়ায়। সাহস চাই, কায়দা জানা চাই।"

কৌটো খুলে জলে চার ফেলতে লাগলুম। একটা ব্যাঙের তেমন পছন্দ হল না। তিড়িক করে লাফ মেরে জলে চলে গেল।

ব্যাঙ ভালো সাঁতার জানে। মাঝ-পুকুরে কে ঘাই মারল।

বড়মামা আনন্দে আটখানা হয়ে বললেন, "আসছে, আজ আমাদের ওইটাই টার্গেট। ঘাই দেখে মনে হচ্ছে কেজি-দশেক হবে। মৃগেল। মাথাটা মেজকে দোব, কী বলিস? কুসিকে ন্যাজাটা। মেয়েরা ন্যাজা খেতে ভালবাসে।"

"আজ পর্যন্ত একটাও তো ধরতে পারলেন না বড়মামা?"

"দাঁড়া। মাছেদের লজ্জা ভাঙুক। মাছেরা একটু লাজুক হয়। তাছাড়া জানিস তো, মনে হিংসে থাকলে জীবজগৎ দূরে সরে যায়। মাছভাজা খাব, মাছভাজা খাব—এই লোভ নিয়ে বসলে, মাছ কেন একটা ব্যাঙও তোমার চারে আসবে না।"

"তাহলে আজ আমরা আলু-ভাতে খাব, আলু-ভাতে খাব—এই ভাব নিয়ে বসি।"

"কোনোরকম খাবার চিন্তা মাথায় আনবি না। মনে কর আমরা উপবাসী ব্রাহ্মণ কিম্বা রোজা-করা মুসলমান।" বড়মামা খুব কায়দা করে মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে ছিপ ফেলতে গেলেন। আম-ডালে বঁড়শি আটকে ছিপ হাতছাড়া হয়ে গেল। হাত-দুয়েক ওপরে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো ছিপ দুলছে। হুইলটা তো কম ভারী নয়!

আমাদের হাইজাম্পের মহড়া চলেছে। নিতাই, গৌর, রাধেশ্যাম, দু'হাত তুলে মারো লাফ। আমপাতা, আমডাল, সবসুদ্ধ নিয়ে ছিপ আবার ফিরে এলো মালিকের হাতে।

বড়মামা বললেন, "বড় শুভ লক্ষণ। আম্রপল্লব শিকার করে উদ্বোধন। এবার যখন ছিপ ফেলব, তুই তখন মাথার দিকটা একটু সামলে দিস তো। আকাশের ওপর আমাদের কোনও অধিকার নেই।"

"তাহলে আপনি একটু বাঁ পাশে সরে আসুন। মাথার ওপর একগাদা ডালপালা ঝুলছে। আবার আটকে যাবে।"

বড়মামা সরে আসতে আসতে বললেন, "গাছের স্বাধীনতা আকাশে।"

ঘুরিয়ে ছিপ ফেললেন। এবার বেশ ফেলেছেন। সুতোয়

টান মেরে ফাতনাটা সোজা করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফড়িং এসে বসে পড়ল।

বড়মামা আয়েস করে বসে পড়লেন, "নে আয়, এবার স্যান্ডউইচ খাওয়া যাক।"

"এর মধ্যে খেয়োখেয়ি শুরু করলেন? সারাটা দিন পড়ে আছে।"

"থাক না, এটা তো টেস্ট কেস। কুসি কেমন করেছে দেখতে হবে না! চোখের দেখা নয়, চেখে দেখা। বুঝলি, আমি ভাবছি—"

"কী ভাবছেন বড়মামা?"

"এই মাছধরা, আর রুগি দেখাটা একসঙ্গে চালালে কেমন হয়, রথ দেখা আর কলা বেচার মতো।"

"তাহলে এই দিঘিটাকে তো চেম্বারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে হয়।"

"ধ্যার বোকা! চেম্বারটাকে এখানে তুলে আনব। ঘর বানাব না, একটা সাদা তাঁবু খাটাব। কিছু রোজগারও তো চাই। এই দ্যাখ না, কখন মাছ ঠোকরাবে কেউ জানে না। তুই চোখ রাখলি ফাতনার দিকে, আমি দেখতে লাগলুম রুগি।"

"আমি আবার অঙ্কও কষতে পারি।"

"ওঃ, তাহলে তো তুই মেঘনাদ বধ হয়ে যাবি রে!"

"আজ্ঞে মেঘনাদ সাহা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আমার প্রায়ই গুলিয়ে যায়। নে, স্যান্ডউইচ নে, তাড়াতাড়িতে বেশ ভালই বানিয়েছে। আজকে ওই বড় মাছটা পাবই। ওটা পেলে, কাল মাছের পুর দিয়ে কচুরি করিয়ে আনব! মাছ ধরার কম ধকল! রোগা না হয়ে যাস।"

বড়রা প্রায়ই বলেন, দুঃখের রাত শেষ হতে চায় না। এ দেখছি মাছ ধরার দুপুরও সহজে সন্ধ্যে হতে চায় না। বড়মামা মাঝে মাঝে বঁড়শি তুলে বলছেন, "যাঃ, টোপ খেয়ে গেছে। নে কৌটোটা খোল। টোপ দে। এবার একটু কেঁচো দে। এবার একটু বোলতার ডিম ছাড়। মাছেদেরও মুখ আছে। মাঝে-মাঝে মুখ পালটে দিতে হয়।"

গরমের দুপুরে ঝিম ধরছে। জল থেকে একটা গরম-ঠাণ্ডা ভাপ উঠছে। মাঝে-মাঝে পানকৌড়ি ছোঁ মেরে জলের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ওপারে গোটাকতক হাঁস প্যাঁকোর-প্যাঁকোর করছে। শরীর ভারী হয়ে আসছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

হুইলের ভীষণ শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলুম। বিরাট মাছ পড়েছে। যাক, এতদিনে বড়মামার হাতযশ দেখা গেল। মেজমামা এবার কাত। উত্তেজনায় বড়মামার চোখ বড়-বড়। মাছ যেভাবে সুতো টানছে, হুইল শেষ হয়ে এল বলে।

পুকুরের দিকে তাকালুম। এ কী, জল স্থির। মাছ তো জলেই খেলবে! বড়মামার ছিপ কোথায়! ছিপ এরিয়েলের মতো শূন্যে খাড়া। পিঠের দিকে বেঁকে আছে ধনুকের মতো। মাছ কি তাহলে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে ছুটছে? কী মাছ রে বাবা!

মাঠের দিকে তাকিয়ে চক্ষুস্থির।

"ও বড়মামা, আপনি কী ধরেছেন?"

"কেন, মাছ?"

"মাছ তো আপনার পেছন দিকে মাঠ ভেঙে ছুটছে।"

"সে কী রে? মেঠো মাছ নাকি?"

"আজ্ঞে না, একটা দামড়া গোরু।"

আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটানে ছিপটা হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। গোরু ছুটছে, ছিপ ছুটছে, আমরা ছুটছি।"

সন্ধ্যে হয়-হয়, আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। দেখার মতো চেহারা হয়েছে আমাদের। লোকে মাছ ধরে বাড়ি ফেরে, আমরা ফিরলুম গোরু ধরে। গোরু আমাদের সঙ্গেই এসেছে। গোরুর মালিকও আছেন। বঁড়শি কেটে বসে গেছে। অস্ত্রোপচার করে বের করতে হবে।

মেজমামা বললেন, "কী কায়দায় এমন করলে?"

বড়মামা বললেন, "ফাতনাটা নড়তেই মেরেছি টান। গোরুটা মনে হয় পেছনে চরে বেড়াচ্ছিল। বঁড়শি গেঁথে গেল পিঠে। গোমুখ্যু মেরেছে ছুট। যত ছোটে, বঁড়শি তত পিঠে ঢোকে। বিশে, বিশে।"

বড়মামার হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল।

গোরু ধরে বড়মামার আবার সুমতি ফিরে এল। রুগিরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। সকলেই বলাবলি করছেন, এ আমাদের সেই পুরনো মুকুজ্যে-ডাক্তার, যাকে যমেও ভয় পায়।

যমে ভয় পেলে কী হয়, বড় দুঃখু, মাছে ভয় পায় না।

সাত

রাত তখন কটা হবে কে জানে। চারপাশে ফটফট করছে চাঁদের আলো। হু হু করে বাতাস বইছে। দক্ষিণের জানলায় লতিয়ে ওঠা জুঁই গাছ দুলে দুলে উঠছে। বড়মামা বলছেন, "ওঠ ওঠ, উঠে পড় শিগগির। ভীষণ ব্যাপার।" বিছানায় উঠে বসলুম। ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি। ঘরে তখনও নীল আলো জ্বলছে।

একই বিছানায় বড়মামা গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। বুকের ওপর আড়াআড়ি পড়ে আছে মোটা সাদা পইতে। নীল আলোয় আরও সাদা দেখাচ্ছে। এক ঝলক চাঁদের আলো নাইলনের মশারি গলে বিছানায় আমাদের পাশে শুতে এসেছিল।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞেস করলুম, "কী হয়েছে বড়মামা? চোর এসেছে?"

"আরে না রে না, চোর আসবে কোন দুঃখে। ছ'টা ছ'রকমের কুকুর ছ'দিকে পাহারা দিচ্ছে এলে চোরের নাম ভুলিয়ে দেবে।"

"তবে?"

"স্বপ্ন দেখেছি রে বোকা। ভীষণ এক স্বপ্ন।"

"বাঘ?"

"বাঘ নয়। গুপ্তধন।"

"কোথাকার গুপ্তধন? আফ্রিকার?"

"আজ্ঞে না, এই বাড়িতে। রাশি রাশি গুপ্তধন। নে ওঠ, উঠে পড়।"

"আজই উদ্ধার করবেন?"

"একদম বকবক করবি না। ভুলে যাবার আগে স্বপ্নটাকে আবার তৈরি করতে হবে।"

স্বপ্ন আবার তৈরি করা যায় নাকি ?"

"আবার প্রশ্ন ?"

"বাঃ, আপনি তো সেদিন বললেন, প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"

"মূর্খ, সেটা হল ধর্মশিক্ষার সময়। বেদবেদান্তের বেলায়। এখন যা বলি তাই কর।"

বড়মামা মশারি তুলে মেঝেতে নামলেন। পেয়ারের কুকুর লাকি সোফার ওপর ঘুমোচ্ছিল, সেও অমনি তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়ে অ্যায়সা গা ঝাড়া দিল, তাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে উলটে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। ছোট্ট একটা ডন মেরে নিল। ভেবেছে ভোর হয়েছে। ভোর হতে এখনও অনেক দেরি। সবে রাত পৌনে তিনটে।

বড়মামা ইজিচেয়ার পাতলেন।

"ইজিচেয়ার কী হবে বড়মামা ?"

"স্বপ্নে ছিল।"

"এই যে বললেন গুপ্তধন ছিল।"

"চুপ। একটাও কথা নয়। স্বপ্ন ভুল হয়ে যাবে। যা বলি মুখ বুজে করে যাও। এই আমি ইজিচেয়ারে বসলুম।"

বড়মামা যেই বসলেন, লাকি কোলে উঠে পড়ল। নামাতে গেলুম, বড়মামা বললেন, "থাক থাক, আমার স্বপ্নে ছিল। তুমি ওই দরজার সামনে দাঁড়াও।"

নির্দেশ পালন করতেই বড়মামা বললেন, "ভেরি গুড, তুমি হলে মা লক্ষ্মী। তা হলে এই হল গিয়ে তোমার স্বপ্নের ফার্স্ট পার্ট। আমি ইজিচেয়ারে বসে লাকির গায়ে হাত বুলোচ্ছি। বেশ, এই আমি হাত বুলোলুম। দরজার কাছটা হঠাৎ আলোয় আলোকময় হয়ে উঠল। চমকে তাকাতেই তোমাকে দেখলুম।"

"আমাকে ?"

"আহা, তোমাকে কেন দেখব ? দেখলুম মা-লক্ষ্মীকে। দরজার

সামনে ঝলমল করছেন। তুমি কি ঝলমল করছ? ম্যাড়ম্যাড় করছ। জিজ্ঞেস করলুম, মা, আপনি কে? উত্তর দিন।"

"বাবা সুধাংশু, আমি মা-লক্ষ্মী, আমাকে চিনতে পারছ না?"

"ভেরি গুড। ভেরি গুড। অবিকল মা-লক্ষ্মী আমাকে এই কথা বলেছিলেন। তুই কী করে জানলি?"

"তা জানি না।"

"মনে হয় মা তোর ওপর ভর করেছেন। আচ্ছা, এরপর মা কী বললেন বল তো?"

"আমাকে চিনতে পারলে না বাবা সুধাংশু। আমাকে তুমি ঠাকুরঘরের পটে রোজই দেখ। তোমার সাধনায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। কী বর চাও বলো?"

"আঃ ভেরি গুড, ভেরি গুড। ঠিকই প্রায় বলেছ, তবে শেষটায় একটু গণ্ডগোল করে ফেলেছ। মা রেগে বললেন, 'ব্যাটা আমাকে তুই চিনবি কী করে? কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। গাড়ি কেনার সময় রোজ আমার পটের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঠুকতে, মা আরও চারটি রুগী এনে দাও, রুগি এনে দাও। মায়ের প্রাণ। সন্তান চাইছে রুগি। ফেরাই কী করে। ঝাঁক-ঝাঁক প্যাঁচা ছেড়ে দিলুম। ফসল খেয়ে ফাঁক করে দিলে। রেশনে পচা চাল এল। খেয়ে সব কাত। তোর রুগি বেড়ে গেল। এখন আর আমাকে চিনবে কেন?'

"আমি অমনি দুম করে লাকিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলুম।"

বড়মামা সত্যি সত্যিই লাকিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন। ইজিচেয়ারে মানুষ একবার ঢুকলে সহজে শরীর বের করতে পারে না। ওঠার সময় হাঁচরপাঁচর করতে হয়। বড়মামা কোনও রকমে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "আমি তখন মাকে বললুম, মা, পায়ের ধুলো দাও মা, এ দীনের অপরাধ তুমি মার্জনা করো মা। এমনি ভাবে নিচু হয়ে মায়ের পায়ের ধুলো নিতে গেলুম।"

বড়মামা ঝুঁকে পড়ে আমার পায়ের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

"আপনি আমার পায়ের ধুলো নেবেন নাকি?"

সামনে ঝুঁকে থাকা অবস্থাতেই বড়মামা বললেন, "ধ্যার বোকা, ধুলো নেবার আগেই তো মা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তুইও অদৃশ্য হয়ে যা।"

"আমি কী করে অদৃশ্য হব? আমি কি স্বপ্ন।"

"গাধা। তুই দরজা খুলে ছাদে চলে যা। চট্ করে যা। কতক্ষণ নিচু হয়ে থাকব? কোমর টনটন করছে।"

"কত দূরে যাব বড়মামা?"

"দরজার পাশে লুকিয়ে থাকবি।"

নির্দেশ-মতো ছাদের দরজা খুলে পাশে জুঁইগাছের কাছে গা-ঢাকা দিয়ে রইলুম। লুকিয়ে লুকিয়ে উঁকি মেরে দেখছি, বড়মামা সামনে আর একটু ঝুঁকে পড়েই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "এ কী মা, তুমি গেলে কোথায়? মা, মা!"

আড়াল থেকে আমি বললুম, "এই যে আমি এইখানে বাবা সুধাংশু।"

স্কুলের থিয়েটারের ডায়ালগ আজ খুব কাজে লেগে যাচ্ছে। বড়মামা কিন্তু ঘর থেকে তেড়ে বেরিয়ে এলেন, "কে তোকে উত্তর দিতে বলেছে! স্বপ্নে মা কি আমায় উত্তর দিয়েছিলেন? মা তো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন।"

বড়মামা রেগে গিয়ে গজগজ করতে লাগলেন। আমি কী করে জানব? স্বপ্ন কি আমি দেখেছি, না মামা দেখেছেন। আগে থেকে রিহারশাল দেওয়া না থাকলে অভিনয়ে গোলমাল তো হবেই।

বড়মামা বললেন, "এইরকম উলটোপালটা করলে স্বপ্ন তৈরি করা যায় না। বারে তুই আমার ভাব নষ্ট করে দিচ্ছিস। দু'-একটা উত্তর শুনে ভেবেছিলুম তোর ওপর মা বোধহয় ভর করেছেন। এখন দেখছি সব বোগাস।"

ধমক খেয়ে জুঁইগাছের পাশে মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ঠিক আছে। নিজের থেকে আর কিছু করব না। এবার যা বলবেন তাই করব।

বড়মামা দরজার বাইরে চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, আমি ছাদে এই জায়গাটায় এসে

দাঁড়ালুম, হ্যাঁ দাঁড়ালুম। তারপর কী হল। মা অদৃশ্য হয়েছেন। চাঁদের আলোয় ফিনিক ফুটছে। কেউ কোথ্থাও নেই। ভীষণ ভয় করছে। হঠাৎ ওই যে, ওই তো ওইখানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি দেখতে পেলুম। স্পষ্ট দেখলুম। চাঁদের আলোয় মা আমার ঝমঝম করে উঠলেন। কিন্তু কোন্‌দিকে ?

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কোন্‌দিকে বল তো ? স্বপ্নে যে দিক ঠিক থাকে না। সব কিছু কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে ছড়িয়ে থাকে।"

একটু আগে ধমক খেয়েছি। অভিমান হয়েছে। আমি বললুম, "আপনার স্বপ্ন আমি কেমন করে বলব ?"

"রাগ করছিস কেন ? একটু সাহায্য কর না। গুপ্তধন পেয়ে গেলে হিমালয়ে গিয়ে একটা পাহাড় কিনব। বরফ-ঢাকা পাহাড়। সেই পাহাড়ে টানেল কেটে একটা আধুনিক গুহা বানাব। সেই গুহায় সব-কিছু থাকবে। রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, টিভি, লাইব্রেরি, গরম জল, ঠাণ্ডা জল, একটা হেলি-প্যাড, হেলিকপটার। অ্যামেরিকা থেকে ইন্‌জিনিয়র আনিয়ে জেমস বণ্ড ছবির কায়দায় সব তৈরি করাব। একটু সাহায্য কর না রে। পেয়ে গেলে তোর আর আমার দুজনেরই বরাত ফিরে যাবে। তোর এই ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানর পড়া আর আমার ওই রোজ ছুঁচ ফোটানো, সব ছেড়ে মনের আনন্দে হিমালয়ে গিয়ে উঠব। চামরিগাইয়ের দুধ চিনি দিয়ে মেরে ঘন করে পাথরের বাটিতে ঢেলে বরফের গর্তের মধ্যে রেখে দোব। জমে আইসক্রিম। রোজ আমরা কাপ কাপ আইসক্রিম খাব। পাহাড়ের গা বেয়ে কাবুলি ফেরিআলারা হেঁকে যাবে, হিং চাইসুর্মা। সঙ্গে সঙ্গে দশ কেজি বারো কেজি আখরোট, কিশমিশ, খুবানি, মনাক্কা, বাদাম কিনে নোব। আইসক্রিমে একবারে গিজগিজে করে দোব। বল না রে কোন্‌দিকে ! এদিকে না ওদিকে, না ওদিকে ?"

"আচ্ছা, মা-লক্ষ্মী যেদিকে দাঁড়িয়েছিলেন, সেদিকে আর কিছু কি ছিল ? পেছনে, সামনে, পাশে, মাথার ওপর ?"

"দাঁড়া, ভেবে দেখি। হ্যাঁ, মাথার ওপর এসবেসটাসের চালের একটা অংশ চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল, তারই ছায়া পড়েছিল

মায়ের মুখে।"

"ব্যাস্, আর বলতে হবে না। পেয়ে গেছি। ওই যে ওই জায়গাটায়। ঠাকুরের পাশে তুলসীগাছের টবের কাছে।"

"উঃ, তোর মাথা বটে। ঠিক বলেছিস। আচ্ছা, ওখানে গিয়ে একবার দাঁড়া তো! দূর থেকে দেখি।"

"বড়মামা আপনি এত সব করছেন কেন? মা লক্ষ্মী কী বললেন, সেইটা মনে পড়লেই তো হয়ে গেল।"

"অ্যায়, ওই জন্যেই তোর ওপর রাগ ধরে যায়। তুই কখনও গাধা, কখনও পণ্ডিত। মা-লক্ষ্মী ছাদে দাঁড়িয়ে বললেন, এদিকে আয়।"

"কাছে গেলুম। বললেন, তোমাদের বাড়িতে গুপ্তধন আছে।"

"আমি বললুম, কোথায় আছে মা?"

"হাসি-হাসি মুখে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার পাশের দেওয়ালে হাত রেখে বললেন, এই লিখে দিলুম।"

"কী লিখলেন মনে আছে?"

"মনে হয়, মনে হয়—"

"মনে করুন, মনে করার চেষ্টা করুন।"

'মনে হয়, মনে হয়—" বড়মামা ঘাড় চুলকোতে লাগলেন। "মনে হয় লিখলেন, ক, খ, গ, ঘ। ওই জায়গায় চল তো, দেখি সত্যিই কিছু লেখা আছে কি না!"

আমরা দু'জনে ঠাকুরঘরের কাছে গেলুম। ছাদে যেন দুধের মতো চাঁদের আলোর ধারা বইছে। ঠাকুরঘরের দেওয়ালে অনেকদিন আগে বালির কাজ করা হয়েছিল। বছরখানেক হল রঙ পড়েছে। দেওয়ালে কোথাও কোনও লেখা নজরে পড়ল না। বড় ইচ্ছে ছিল মা-লক্ষ্মীর হাতের লেখা দেখব।

বড়মামা ভীষণ হতাশ হয়ে বললেন, "কী হল বল তো? জায়গাটা মনে হয় ঠিক হল না।"

"স্বপ্ন কি আর সত্যি হয় বড়মামা, তা হলে পরীক্ষার আগে স্বপ্নে যেসব প্রশ্ন দেখি তার একটাও অন্তত আসত।"

বড়মামা আবার রেগে গেলেন, "তুমি ঘোড়ার ডিম জানো।

লিংকন স্বপ্ন দেখে মারা গিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ, কোথায় যেন পড়েছি।"

"পড়েছ যখন তখন অবিশ্বাস করছ কেন? ইংল্যান্ডে জে ডব্লু ডান নামের এক ভদ্রলোক ছিলেন, জানো কি?"

"আজ্ঞে না।"

"তাহলে স্বপ্নকে অবিশ্বাস করছ কেন?"

"তিনি কে ছিলেন?"

"একজন ইনজিনিয়ার। যা-তা নয়, উড়োজাহাজের ইনজিনিয়ার, বিজ্ঞানী। তিনি একদিন স্বপ্ন দেখলেন তাঁর হাতঘড়িটা রাত সাড়ে চারটের সময় বন্ধ হয়ে গেছে। পরের দিন সকালে উঠে দেখলেন, সত্যিই তাই—ঘড়ি সাড়ে চারটে বেজে অচল হয়ে আছে। কী বুঝলে, তোমার কিছু বলার আছে?"

"আজ্ঞে না।"

"সেই ডানসায়েব আর-একদিন স্বপ্ন দেখলেন, পৃথিবীর কোথাও একটা আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে, শত শত লোক লাভাস্রোতে পুড়ে মারা গেছে। মৃতের সংখ্যা চার হাজার। তিনি স্বপ্নে খবরের কাগজের হেডলাইনও পড়ে ফেলেছিলেন। পরের দিন কাগজ খুলেই চমকে উঠলেন, প্রথম পাতার খবর বড় বড় অক্ষরে হেডলাইন, মার্টিনিতে অগ্নুদগার, মৃত চার হাজার। পরের দিন আবার ভ্রম সংশোধন—মৃত চার নয়, চল্লিশ হাজার। তার মানে স্বপ্নে কাগজ পড়ার সময় ডান চল্লিশকে চার হাজার পড়েছেন, শূন্যের গোলমাল। কিছু বলার আছে?"

"আজ্ঞে না।"

"তা হলে?"

"তা হলে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন, কিছু কিছু লেখা আছে যা জলে ভেজালে তবেই পড়া যায়। মা-লক্ষ্মী মনে হয় সেই রকম কোনও কালি ব্যবহার করেছেন। দেওয়ালটাকে জলে ভেজালে তবেই পড়া যাবে।"

"আঃ, সাংঘাতিক বলেছিস। তোর মাথাটা আমি বাঁধিয়ে রেখে দোব।"

খড়াস করে একটা শব্দ হল। বড়মামা চমকে উঠলেন। ছাদের ও-মাথায় মেজমামার ঘর। দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে এলেন। ঘরে আলো জ্বলছে। বড়মামা ঠোঁটে আঙ্গুল রাখলেন, মানে একটাও কথা নয়। মেজমামা কবি মানুষ। দু'পাশে দু'হাত মেলে চাঁদের আলো ধরছেন। সাবান মাখার মতো গায়ে মাখছেন। বড়মামা বললেন, "গুঁড়ি মেরে ঘরে চলো। দেখতে না পায়।"

মেজমামা বলছেন, "কে, কে ওখানে?"

আর কে! আমরা ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে দিয়েছি। লাকিটা তিন লাফে ঘরে এসে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়েছে।

সকাল বেলার চায়ের টেবিল।

আমার মেজমামা সব সময় ফিটফাট। চোখে ইয়া মোটা পুরু ফ্রেমের চশমা। দু'পায়ের মাঝে চটির ওপর পাখার মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে দিশি ধুতির কোঁচা। সামনে বোতাম লাগানো, হাফহাতা, গোলগলা গেঞ্জি। ধবধব করছে সাদা। পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল।

মেজমামা চেয়ারে এসে বসেছেন। কোলের ওপর খবরের কাগজ। মুখ তোলার অবসর নাই। টেবিলে কাপ ডিশ চামচে এসে গেছে। চিনির পাত্র, দুধের পাত্র এসে গেছে, চা এল বলে। বড়মামামার দেখা নেই। অন্যদিন বড়মামাই আগে এসে বসেন, আর দানা দানা চিনি খান। আমি জানতুম আজ আসতে একটু দেরি হবে। আমি এখন বড়মামার গুপ্তচর হয়ে বসে আছি। মেজমামার গতিবিধির দিকে নজর রাখছি। নড়াচড়া কি ওঠার চেষ্টা করলেই যে কোনও একটা পড়ার প্রশ্ন করব। এই ঘরে মেজমামাকে যেমন করেই হোক আটকে রাখতে হবে। বড়মামা এখন দেওয়াল জল দিয়ে ভিজোচ্ছেন। সত্যিই যদি ক, খ, গ, ঘ লেখা ফুটে ওঠে, তা হলে আজ রাত থেকেই শুরু হয়ে যাবে গুপ্তধন খোঁজার কাজ।

মেজমামা কাগজ থেকে মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকালেন। খুবই সন্দেহজনক। হঠাৎ না উঠে পড়েন! মাসিমা কী করছেন। চা এসে গেলে বাঁচা যায়। কড়া নিয়ম। পাঁচ মিনিট ভিজবেই। মেজমামা উঠে দাঁড়ালেন।

"কী হল মেজমামা ?"

"চায়ের এখনও দেরি আছে মনে হচ্ছে। যাই, আর একটা কাজ ততক্ষণ সেরে আসি।"

"না না, দেরি নেই। এখুনি আসবে।"

"কী করে জানলে ? চা তো তুমি কর না, চা করে কুসি।"

"মেজমামা, একটা জিনিস আমার খুব খারাপ লাগে।"

"কী জিনিস ?"

"বসুন বলছি।"

"আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনব। তুমি বলো।"

"এই বড়মামা, প্রায়ই আপনার কবিতা নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করেন।"

"কী বলে ?"

ব্যাস্ ওষুধ ধরে গেছে। মেজমামা বসে পড়লেন, "কী, বলে কী ?"

"বলেন, রবীন্দ্রনাথের পর কবিতা লেখার চেষ্টা করাটাই অন্যায়। কিছুই হয় না, শুধু শুধু পণ্ডশ্রম। গোরুর জাবরকাটার মতো।"

"আচ্ছা, তাই নাকি ? উনি এবার ডাক্তারি ছেড়ে কাব্যসমালোচক হলেন। এর নাম কি জান ? অনধিকারচর্চা। শুনবে তা হলে আমার একটা কবিতা ! কাল সারারাত ধরে লিখেছি। দাঁড়াও, খাতাটা নিয়ে আসি।"

মরেছে রে ! এইবার আমি কী করি। মেজমামা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন।

"মেজমামা, আপনি বসুন, খাতা আমি নিয়ে আসছি।"

"তুমি খুঁজেই পাবে না। সে আমি এক গোপন জায়গায় রেখে এসেছি।"

"আমাকে বলে দিন, ঠিক নিয়ে আসব। আপনি আবার ওপরে উঠবেন, আবার নীচে নামবেন, কী দরকার।"

"কেন, আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি ? গোটা দুয়েক চুল পাকলে মানুষ বুড়ো হয়ে যায় ! ঘোড়ার ডাক্তারের ওসব কথায় কান দিও না, পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে।"

আর বোধহয় মেজমামাকে আটকানো গেল না, দরজার কাছে চলে গেছেন। বড়মামার এজেণ্ট হিসেবে একেবারে ফেল করেছি। যাক, ভগবান বাঁচালেন। বড়মামা আসছেন। এবার মেজমামা যেখানে খুশি যেতে পারেন। মেজমামা বড়মামার পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে মুখের দিকে তাকিয়ে ফুঃ করে একটা শব্দ করলেন। বড়মামা তেমন খেয়াল করলেন না। নিজের আনন্দেই মশগুল। ঘরে ঢুকে বললেন, "পেয়ে গেছি, একেবারে স্পষ্ট। স্বপ্ন আমার কোনও দিন মিথ্যে হয়নি, সেই ছেলেবেলা থেকে, স্বপ্ন দেখলুম মাসিমার সিকেতে পুলিপিঠে ঝুলছে। স্পষ্ট স্বপ্ন, যেন কড়িকাঠ থেকে টিকটিকি হয়ে ঝুলতে ঝুলতে দেখছি। স্কুল ফেরার পথে গিয়ে দেখি, ঠিক তাই।"

"কালির লেখা বড়মামা ?"

"মা-লক্ষ্মী কালি কোথায় পাবেন। প্ল্যাস্টারে সব চুলের মতো কাট ধরেছে। অলৌকিক ফাটল। যেই জল পড়ল অমনি স্পষ্ট ফুটে উঠল, ক, খ, গ, ঘ। কাউকে বলবি না। টপ সিক্রেট।"

"মেজমামাকে আটকাতে পারছিলুম না, তাই আপনার নাম করে রাগিয়ে এতক্ষণ ধরে রেখেছিলুম। এইমাত্র হাতছাড়া হয়ে পালালেন। এখুনি আসছেন কবিতা শোনাতে।"

"উঃ, সর্বনাশ করেছে। এর চেয়ে ছেড়ে দেওয়াই ভাল ছিল রে। কী বলেছিস ?"

"সেই রবীন্দ্রনাথ আর এখনকার কালের কবিতা।"

"অন্যায় কী বলেছিস ? হেঁকে বল। মাইক নিয়ে বল।"

চা নিয়ে মাসিমা, খাতা নিয়ে মেজমামা প্রায় এক সঙ্গেই ঢুকলেন। মেজমামা খাতা খুলে পড়তে শুরু করলেন,

দিন শেষ হলে রাত আসে
রাত শেষ হলে দিন আসে
আকাশের চাকা অহরহ
ঘুরেই চলেছে, ঘুরছে ॥

বড়মামা কাপের গায়ে চামচে দিয়ে টাং করে একটা শব্দ করে বললেন, "আহা, অহো !" তারপর নিজেই চারটে লাইন বানিয়ে

ফেললেন,

জল জমলে মশা বাড়ে
মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া
কুইনিন খেলে জ্বর ছাড়ে
বড় হয়ে ওঠে পিলে ॥

মেজমামা বললেন, "ওটা একটা কবিতা হল ?"

"তোমারটা যদি হয়ে থাকে, আমারটাও হয়েছে, পরিষ্কার মানে, নিখুঁত অন্ত্যমিল।"

"আর আমারটা ?"

"তোমারটা পাগলের প্রলাপ ভাই। বিকারের রুগির প্রলাপ, অনেকটা এই রকম,

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে
ভুতের বেগার খেটে মরে
হাত ঘুরলে নাড়ু পাবে
নইলে নাড়ু কোথায় পাবে ॥

মাসিমা বললেন, "মরেছে, সাতসকালেই শুম্ভ নিশুম্ভ শুরু হল। পয়সা থাকলে দুটোকেই আমি হস্টেলে পাঠিয়ে দিতুম।"

মেজমামা বললেন, দ্যাখো দাদা, সমালোচনা মানে ব্যঙ্গ করা নয়। কবিতার তুমি কী বোঝ হে ! ঘরের চারটে লাইন শুনলে তোমার সন্ন্যাসী হয়ে যেতে ইচ্ছে করবে,

জাঁতায় পড়েছে মানুষ
অহঙ্কারে ফানুস
জীবনের চাপে চোখ ঠেলে আসে
মরণ মরে না তবু ॥

বড়মামা বললেন, "অহো, অহো, হৃদয়ের চাপ সহিতে পারি না, বুক ফেটে ভেঙে যায় মা ॥"

মাসিমা রেগে গিয়ে বললেন, "তোমাদের তর্জা থামাবে, নয়তো ওই দরজা আছে।"

মাসিমার কথায় কাজ হল। দুজনের ঠোঁটাই চায়ের কাপের দিকে নেমে এল। মাসিমার কাছে দুজনেই জব্দ।

মেজমামা কয়েক চুমুক চা খেলেন। দু-একবার জানালার বাইরে রোদের দিকে তাকালেন, তারপর হঠাৎ একসময় বলে উঠলেন, "আমার আর কোনও সন্দেহ নেই।"

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "বাঃ, এই তো আমার লক্ষ্মী ছেলে, এতদিনে বুঝলে তাহলে, কবিতা লেখা সহজ কাজ নয়।"

মেজমামা বড়মামার কথা কানেই তুললেন না, আপন মনেই বলে চলেছেন, "এতদিনে, আমি নিঃসন্দেহ, এ বাড়িতে ভূত আছে।"

বড়মামা বললেন, "অবশ্যই আছে। আমি বহুবার দেখেছি।"

আমার কানের কাছে মুখ এগিয়ে এনে ফিসফিস করে বললেন, "খুব ভয় দেখিয়ে দি, আমাদের কাজের সুবিধে হবে। গুপ্তধনের কাজ খুব গোপনে করতে হয়, আমি বইয়ে পড়েছি। ওর চেহারাটা দেখেছিস, ঠিক ভিলেনের মতো। লাস্ট মোমেণ্টে গুপ্তধন নিয়ে সরে পড়তে পারে। তুই আমাকে সাপোর্ট করে যা।"

মেজমামা বললেন, "ছাদ বড় ডেন্‌জারাস, জায়গা বড়দা। সব বাড়ির ছাদেই একটা না একটা কিছু থাকে। গুলিগড়ায়, বল চলে বেড়ায়, পায়ের শব্দ শোনা যায়, ধুপধাপ আওয়াজ হয়। বাড়িতে ওই জন্যে ছাদ রাখতে নেই।"

বড়মামা হাসতে হাসতে বললেন, "বললি বটে। ছাদ ছাড়া বাড়ি হয়!"

"কেন হবে না, ঢালু ছাদ কর, টিনের চালা কর, খড়ের চাল কর, যাতে ভূতের পা স্লিপ করে।"

"ভূতের আবার পা হয় নাকি!"

"নিশ্চয়ই হয়, তা না হলে শব্দ করে কী করে! মাঝ-রাতে লোহার বল নিয়ে খেলে কী করে! কাল রাতে আমি এক জোড়া ভূত দেখেছি। অবিকল মানুষের মতো চেহারা, কেবল সামান্য একটু কুঁজো। কিছু মনে কোরো না বড়দা, ভূতের চেহারার সঙ্গে তোমাদের চেহারার অদ্ভুত মিল আছে। আমি কাল বড় ভূত, ছোট ভূত একসঙ্গে দেখেছি। তবে এও দেখলুম, ভূত মানুষকে ভীষণ ভয় পায়। আমাকে দেখে কুঁজো হয়ে ভূতজোড়া পালাল। পুরোহিতমশাইকে ডেকে একটু শান্তি স্বস্ত্যয়ন করতে হবে।

তিলপড়া, সরষেপড়া, জলপড়া।"

শেষ চুমুক চা খেয়ে মেজমামা চেয়ার ছেড়ে উঠে গটগট করে চলে গেলেন।

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বলো তো, ঠিক ধরতে পারলুম না হে! এ যেন সেই, তুমি যাও ডালে ডালে, আমি যাই পাতায় পাতায় গোছের চরিত্র। সাবধান। স্বপ্নের কথা কেউ যেন জানতে না পারে, বুঝলে।"

বড়মামা নিজের জন্য আর এক কাপ চা তৈরি করলেন।

মোক্ষদা এসে বললে, "তিনজন রুগি এসে বসে আছে যে গো! বলছে, ছিরিয়াছ কেছ।"

বড়মামা উদাস সুরে বললেন, "হ্যাঃ, সবই সিরিয়াস।"

ঠাকুরঘরের দেওয়ালের প্ল্যাস্টার জলে ভেজালে, চুল-চুল কাটা বেড়ালের নখের আঁচড়ের মতো ফুটে উঠেছে। ভাল করে তাকাল, সত্যিই ক খ গ ঘ চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। বড়মামাকে মজা করে বলে ছিলুম, এখন নিজেই আবাক হয়ে যাচ্ছি। স্বপ্ন তাহলে সত্যি। মা-লক্ষ্মীর সঙ্গে সব সময় এত বড় একটা সাদা প্যাঁচা ঘোরে। প্যাঁচার বড় বড় নখ আছে। সেই নখের লেখা। মামারা একসময় জমিদার ছিলেন। জমিদারবাড়িতে, রাজবাড়িতে গুপ্তধন থাকে, আমি বইয়ে পড়েছি।

দেখি, মা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে পায়ের ছাপ পড়েছে কি না! নিচু হতেই চকচকে কী একটা নজরে পড়ল। কী রে বাবা! আরে এ যে দেখছি সোনার দুল। মায়ের কান থেকে খুলে পড়ে গেছে। থালায় গিয়ে জমা দেওয়া উচিত। ছেলেবেলা থেকে পড়ে আসছি, পরের দ্রব্য কুড়াইয়া পাইলেও গ্রহণ করা উচিত নয়। এখন আমার কাছে থাক, বড়মামা চলে গেছেন। ফিরে এলে, পরামর্শ করে যা হয় কিছু করা যাবে।

বেলা দুটো নাগাদ বড়মামা ফিরে এলেন। আশ্বিনের রোদে মুখ-চোখ লাল জবাফুল। এক হাতে ডাক্তারি ব্যাগ, আর-এক হাতে খানচারেক ঘুড়ি। মাসিমা বললেন, "তুমি কি ভিজিটের বদলে টাকা ফেলে ঘুড়ি নিয়ে এলে? অবশ্য গ্রামের ডাক্তাররা লাউ,

কুমড়ো, কাঁচকলা ভিজিট পায়। ভালই করেছ।"

অন্যসময় হলে বড়মামাতে মাসিমাতে লেগে যেত। আজ বড়মামার মুখে দেবতার হাসি।

কোনও রকমে খাওয়াদাওয়া সেরে বড়মামা ঘরে এসেই দরজা দিলেন। অন্যদিন এই সময়ে একটু শুয়ে পড়েন, আজ মেঝেতে বাবু হয়ে বসলেন। আমি বড়মামার ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে, জানলায় ঠ্যাং তুলে দিয়ে, ট্রেজার আইল্যাণ্ড পড়ছিলুম।

বড়মামা বললেন, "আয়, নেমে আয়। আমাদের এখন অনেক কাজ। অনেক মাথা খাটাতে হবে। ক খ গ ঘ-র রহস্য উদ্ধার করতে হবে। মা একটা সঙ্কেত রেখে গেছেন। সেই সঙ্কেত উদ্ধার করতে হবে। অনেক ভেবে একটা কোড উদ্ধার করেছি।

"কোন্‌টা?

"ঘ। ঘ-এ ঘুড়ি। চারখানা ঘুড়ি কিনে এনেছি।"

"ঘুড়ির সঙ্গে গুপ্তধনের কী সম্পর্ক!"

"উঃ, তোর মতো অশিক্ষিত আমি খুব কম দেখেছি। একটু যদি লেখাপড়া করতিস! রবীন্দ্রনাথের গুপ্ত ধন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যকের ধন।"

"আজ্ঞে পড়েছি। ওই সবই তো আমি পড়ি।"

"তাই যদি পড় বাছা, তাহলে বোঝ না কেন, গুপ্তধনের আগে সঙ্কেত, পরে একজন কুচক্রী শয়তান, তারপর এক রাউণ্ড ফাইট, তারপর গুপ্তধন। মনে পড়ে গুপ্তধন গল্পে সন্ন্যাসী হরিহরকে যে তুলট কাগজ দিয়েছিলেন, তাতে কী লেখা ছিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এতবার পড়েছি একেবারে মুখস্থ,

পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা॥
তেঁতুল-বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে॥

ঈশান কোণে ঈশানী
কহে দিলাম নিশানী ॥"

"বাঃ, ফাসক্লাস। ওই ধাঁধা ভেঙে মৃত্যুঞ্জয় কী পেল?"

"আজ্ঞে ধারাগোল, একটা গ্রামের নাম।"

"ভেরি গুড। বুঝলি, রবীন্দ্রনাথ ইজ রবীন্দ্রনাথ। এসো, তাহলে আমাদের সংকেতের অর্থটা উদ্ধার করে ফেলার চেষ্টা করি। ক। ক মানে কী?"

"ক মানে ক।"

"তোমার মাথা, ওইজন্যে রাগ ধরে। ক দিয়ে কী কী হয়, কী কী শব্দ, গবেট!"

"আজ্ঞে, কালি, কলম, কাজল, কমলা কয়লা, কলস, কেবল, কলা, কদম, কমল, কুসুম, কালা, কিল, কুল, কাঁটা, কাদা।"

বড়মামা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, "বড় ডেঁপো হয়ে গেছ।"

"বাঃ, ক-দিয়ে যা যা মনে আসছে বলছি। এই তো বললেন, ক দিয়ে যে শব্দ হয় বলতে।"

"ওভাবে হবে না। অভিধান আনো।"

"মেজমামার ঘরে।"

"ঘরে আছে?"

"না, কলেজে।"

"নিয়ে এসো। আনার সময় দেখে আসবে, কীভাবে রাখা ছিল। ফেস ডাউন অর ফেস আপ, রাখার সময় সেইভাবে রেখে আসতে হবে, যেন ধরতে না পারে। বুঝলে?"

অভিধান নিয়ে ফিরে এলুম। বড়মামা বললেন, "ক-এর এলাকায় ঝট করে একটা পাতা উলটে ফেল। কী পেলি?"

"আজ্ঞে, করকচ, করকচি, করকর, করকা, করগ্রহ, করঙ্ক, করঙ্গ, করঞ্জা।"

"ফেলে দে, ফেলে দে। কিস্যু নেই ওতে। হোপলেস, হোপলেস। আবার খোল। মুড়ে ঝপাস করে খোল। কী পেলি?"

"আজ্ঞে, কোঁ, কোঁক, কোঁকড়া, কোঁড়, কোঁত, কোঁৎকা।"

"ধ্যাত, তোমার হাতে ভাল কিছু উঠবে না। তখনই সাবধান করেছিলুম, অত মুরগির ডিম খেও না, গলা দিয়ে কোঁকর কোঁ-ই বেরোবে। দাও, আমার হাতে দাও। তোমার হাত নষ্ট হয়ে গেছে।"

বড়মামা অভিধান নিয়ে ঝট করে একটা জায়গা খুললেন।

"কী পেলেন বড়মামা?"

করুণ মুখে বড়মামা বললেন, "বীভৎস! কল্পী, কল্প্য, কল্মষ, কল্মা, কশ, কশা, কশাড়, কশিদা। ফেলে দে, ফেলে দে। এভাবে হবে না। এইসময় বেশ মাথাঅলা একজন কাউকে পেলে বেশ হত। ক-তেই এ অবস্থা! এখনও খ আছে, গ আছে, ঘ আছে। আচ্ছা শোন।"

"বলুন।"

"গুপ্তধন তো তোর আমার একার হতে পারে না। করালীরও ভাগ আছে।"

"করালী কে?"

"যকের ধন পড়িসনি?"

"হ্যাঁ।

"তাহলে আবার বোকার মত প্রশ্ন করছিস কেন, করালী কে? এ কেসে করালী হয়ে দাঁড়াবে মেজ। প্রথম থেকেই সে পথ মেরে দিতে হবে।"

"বুঝেছি।"

"কী বুঝেছিস?"

"আমরা করালী হয়ে যাব। উল্টো রথের মতো, উল্টো যকের ধন লেখা হবে। মেজমামার মাথা ভাল। মেজমামাকে আমরা দলে টেনে নোব। লাস্ট মোমেন্টে সিন্দুক টা যখন—"

"সিন্দুক নয়, চেন-বাঁধা পেতলের ঘড়া, স্বপ্নে আমি সেইরকমই দেখেছি।"

"আচ্ছা, তাই হোক, সিন্দুকের বদলে যেই ঘড়া বেরোবে, আমরা করালী হয়ে যাব।"

বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হল। মেজমামা ফিরলেন।

বড়মামার এক রুগি, বড়মামাকে খুব সুন্দর বিস্কুট-রঙের একটা টি-সেট প্রেজেন্ট করেছেন! ভদ্রলোকের মেয়ে সেলাই করতে করতে পাখিছুঁচ খেয়ে ফেলেছিল। বাঁচার আশাই ছিল না। ছুঁচ রক্তে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কখনও পেটে খোঁচা মোরে, কখনও বুকে খোঁচা মারে। বড়মামা কীভাবে যেন বাঁচিয়ে দিলেন। মনে হয়, ম্যাগনেট খাইয়েছিলেন।

বড়মামা ছোটখাটো একটা টি-পার্টি দিয়েছেন। মেজমামা আর মাসিমা নিমন্ত্রিত। সেই বিস্কুট-রঙের টি-সেটের আজ উদ্বোধন হল। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট আর চানাচুর আছে। এক চুমুক চা খেয়ে বড়মামা বললেন, "বন্ধুগণ, আজ তোমাদের জন্যে একটি সুসংবাদ আছে

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, "বন্ধুগণ কী বন্ধুগণ? তুমি কি নির্বাচনী সভা ডেকেছ?"

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "শত্রুগণ?"

মেজমামা লাফিয়ে উঠলেন, "শত্রুগণ! আমি প্রতিবাদে চা-সভা পরিত্যাগ করছি?"

"ও, তুমি দেখি শাঁখের করাত। যেতেও কাট, আসতেও কাট। বন্ধুগণও পছন্দ নয়, শত্রুগণও পছন্দ নয়, তাহলে তোমরা আমার কে? বলে দাও।"

"কেন, ভ্রাতা আর ভগিনী বলা যায় না, ব্রাদার অ্যান্ড সিসট্‌ার!"

মাসিমা বললেন, "সত্যিই, তোমরা দু'জনে একেবারে বিগড়ে গেছ। তোমাদের সংশোধনী স্কুলে দিতে না পারলে মানুষ হবার আশা নেই।"

বড়মামার কানে কানে বললুম, "করছেন কী? এখন মেজমামাকে চটাচ্ছেন কেন? আমাদের মাথাটা চাই। তারপর তো করালী হবই।"

বড়মামা বললেন, "ইস্, একদম ভুলে গেছি। দাঁড়া, সামলে নিচ্ছি। আমার প্রাণের ভ্রাতা, আমার প্রাণের ভগিনী।"

মাসিমা বললেন, "না না, তোমার মতলব ভাল নয়। সেবারের

মতো আবার বাইরে যাবার তালে আছ। আমার ঘাড়ে যত কুকুর, বেড়াল, গোরু মোষ। ওসব আর সামলাতে পারব না।"

"বৎসে, স্থিরোভব। তোমাদের এখন আমি যে সংবাদ দোব, তা শুনলে তোমরা দু'জনেই তাথৈ তাথৈ করে নৃত্য করবে। আমি এই বাড়িতে অবশেষে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। আমাদের কোনও এক পূর্বপুরুষের সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার।"

মেজমামা হুঁ হুঁ, হুঁ হুঁ করে গলার এক অদ্ভুত শব্দ করলেন।

বড়মামা বললেন, "এর মানে?"

মেজমামা এবার পা নাচাতে নাচাতে সেইরকম শব্দ করলেন।

বড়মামা বললেন, "অবিশ্বাস করছিস?"

মেজমামা এবার নিজেকে ভাঙলেন, "আমিও পেয়েছি বিগ ব্রাদার!"

"তার মানে?"

"মানে খুব সহজ, ক খ গ ঘ।"

বড়মামা চমকে উঠলেন। মুখ দেখে মনে হল চোপসানো বেলুন। আমার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বললেন, "বিশ্বাসঘাতক! তুমি ডবল এজেণ্ট হয়ে বসে আছ!"

"যাব বাবা, যত দোষ নন্দ ঘোষ। আমি কিছুই জানি না বড়মামা। মেজমামাকে আমি কিছুই বলিনি।"

"তাহলে জানল কী করে?"

"তা আমি জানি না, মেজমামাকে জিজ্ঞেস করুন।"

মেজমামা বললেন, "তুমি যেভাবে জেনেছ, আমিও সেইভাবে জেনেছি। একই স্বপ্ন দুজনে, একই সময়ে দেখেছি।"

"তা কখনও হয়!"

"এই তো হয়েছে।"

"তুমি ক খ গ ঘ-এর রহস্য উদ্ধার করতে পেরেছ?"

"তুমি পেরেছ?"

"না।"

"আমিও পারিনি।"

"এসো তাহলে, হাত মেলাও।"

"মেলাও।"

"মাসিমা চেয়ার ঠেলে উঠতে উঠতে বললেন, নাও, এবার আর এক পাগলামি শুরু হল। বিরাশি সালে গুপ্তধন! লোকে শুনলে হাসবে।"

মাসিমা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। দুই মামা বসলেন, রহস্য সমাধানে।

বড়মামা বললেন, "তাহলে ক দিয়ে শুরু করা যাক।"

"হ্যাঁ, ক। ক হল এই বাড়ির এমন একটা অংশ যার প্রথম অক্ষর ক। ক এই চৌহদ্দির মধ্যেই আছে, বাইরে কোথাও নেই। নাও, এইবার খুঁজে বের করো। পরিধি অনেক ছোট হয়ে এল কেমন?"

"উঃ, তোর মাথা বটে! নাঃ, কবি। তুই ভালই লিখিস!"

"বলছ! পরে আবার মত পালটাবে না তো?"

"নেভার।"

"ভাগনে, ক দিয়ে কী কী আছে, আমরা বলে যাই, তুমি লিখে যাও।"

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "কলাঝাড়।"

"রাইট, কলাঝাড়। এবার লেখো, কয়লার ঘর।"

"রাইট, কয়লার ঘর, লেখো কলতলা।"

"ঠিক, কলতলা। তারপর?"

"তারপর? আর তো কিছু নেই।"

"আচ্ছা, এবার তাহলে খ-এ এসো। এই তিনটে জায়গার কাছাকাছি খ কোথায় আছে?"

আমি বলুম, "কেন? কলতলার পাশেই রয়েছে খড়ের ঘর।"

দু'মামাই লাফিয়ে উঠলেন, ব্রিলিয়েণ্ট, ব্রিলিয়েণ্ট, এ ছেলে শার্লক হোমস হবে।

মেজমামা বললেন, "আর কিছু দরকার নেই, বাকিটা জলবৎ তরলং, কলতলায় খড়ে ছাওয়া গোরুর ঘর, ক খ গ ঘ। পেয়ে গেছি বড়দা, আর ভাবনা নেই। নাও চা বলো। মিউজিক, মিউজিক লাগাও।"

বড়মামা চেয়ারের পেছনে শরীর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "ওই জন্যেই বলে, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইটেড উই ফল।"

বড়মামা একই সঙ্গে রেকর্ডপ্লেয়ারে চাপালেন সেতার আর টেপরেকর্ডারে চাপালেন সানাই। মেজমামা প্রশ্ন করলেন, "এটা কী হল?"

"কেন? ফাসক্লাস যুগলবন্দী।"

"ও, যুগলবন্দী! যেমন তুমি আর আমি! তাহলে তুমি হলে ওই সানাই, আমি হলুম গিয়ে সুললিত সেতার।"

"তা কেন, তুই হলি সানাই। প্যাঁ করে পোঁ ধরে আছিস, একটু কর্কশ।"

"আমি কর্কশ, আর তুমি হলে মধুর, নিজের সম্বন্ধে তোমার কী উচ্চ ধারণা, তাই না!"

"জানিস আমি ডাক্তার! জীবনদান করি।"

"জানো আমি অধ্যাপক। আমি জ্ঞান দান করি বলেই তুমি ডাক্তার।"

"তোর জ্ঞানে মানুষ গোরুর ডাক্তার হয়।"

"তুমি কি নিজেকে তার চেয়ে বড় কিছু ভাবো?"

মাসিমা গটগট করে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন, "তোমরা দ'জনেই বেরোও, বেরিয়ে যাও। যে যার ঘরে গিয়ে দরজা দিয়ে বোসো।"

বড়মামা বললেন, "আমি তো আমার ঘরেই রয়েছি রে কুসি!"

পুরোহিতমশাই কাঠের চৌকির ওপর বসে কাঁসার গেলাসে চা পান করছেন। পরনে পট্টবস্ত্র, গলায় চাদর। মনে হল এইমাত্র পূজা সেরে উঠে এলেন। এক চুমুক চা খেয়ে, জিবে আর দাঁতে একটা চুকচুক শব্দ করে বললেন, কী বললে ডাক্তার, কী প্রতিষ্ঠা করবে?

"আজ্ঞে, মা-লক্ষ্মীর কানের দুল।"

"অ্যাঁ, সে আবার কী? লোকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করে, দেবদেবী প্রতিষ্টা করে, তুমি কী প্রতিষ্টা করবে বললে?"

পুরোহিতমশায়ের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, তাই মনে হয় এক-কথা

একশোবার বললে তবেই বুঝতে পারেন। বড়মামা আবার বললেন, "আজ্ঞে, মা-লক্ষ্মীর কানের দুল।"

"ও বস্তু তুমি পেলে কোথায়?"

"আজ্ঞে, আমি পেয়েছি। অলৌকিক উপায়ে পেয়েছি। সবই আমার মায়ের দয়ায়।"

"যাক্, সে আমার জানার দরকার নেই! কোথায় প্রতিষ্ঠা করবে?"

"আমাদের ঠাকুরঘরে।"

"বেশ, দেখি, ওই পাঁজিটা আমার হাতের কাছে এগিয়ে দাও!"

আমি পাঁজিটা এগিয়ে দিলুম। পাতার পর পাতা উলটে এক জায়গায় এসে তাঁর চোখ স্থির হল। সামনে ঝুঁকে পড়ে বিড়বিড় করে কী পড়লেন, তারপর বললেন, হ্যাঁ, কাল সকালেই একটা দিন আছে। নটা পনেরো গতে সকাল বারোটা এক।"

বড়মামা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, কালই হোক, খুব ভাল সময়।"

"তাহলে আমি একটা ফর্দ করে দি।"

প্রায় এক ফুট লম্বা একটা ফর্দ হাতে আমরা দু'জন সেই পবিত্র ধাম ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলুম। রহমতুল্লার রিকসা অপেক্ষা করছিল। দুজনে উঠে বসলুম। বড়মামা ফর্দ পড়তে গিয়ে প্রথমেই হোঁচট খেলেন, "একটি স্বর্ণ-সিংহাসন, স্বর্ণ-সিংহাসন মানে সোনার সিংহাসন, তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সে তো প্রচণ্ড দাম হবে রে!"

"তাতে কী হয়েছে বড়মামা, গুপ্তধন ধরুন পাওয়াই হয়ে গেছে, মায়ের দুল প্রতিষ্ঠার পরই তো আমরা গোয়ালের মেঝে খুঁড়তে শুরু করব, তারপর ট্যাং করে একটা আওয়াজ। শাবল গিয়ে লাগবে ঘড়ার কানায়। গুপ্তধন মানে কী বড়মামা?"

সাঁই সাঁই করে রিকশা ছুটছে। বাতাসে বড়মামার চুল উড়ছে। আমার দিকে অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "যাব বাবা, সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে শেষে এই প্রশ্ন?"

"না, তা নয়, আমি বলছি, সে-যুগের টাকা বেরুলে তো

কোনও কাজে লাগবে না, এ যুগে অচল। মোহর বেরুলে, মেজমামা বললেন, গভরন্‌মেণ্ট গুপ্তধন আইন অনুসারে নিয়ে নেবে।"

"মেজ? আবার তুই সেই অপোজিসন ক্যাম্পে চলে গেছিস? মেজ আমার এনিমি। স্বপ্নটপ্ন সব বাজে, তুই-ই তাহলে মেজকে বলেছিলিস?"

"সত্যি বলছি, আমি বলিনি। মা-লক্ষ্মী সেদিন দু'কপি স্বপ্ন তৈরি করে, এক কপি আপনার ঘুমে, আর এক কপি মেজমামার ঘুমে ছেড়ে দিয়েছিলেন।"

রিকশা থেকে বাড়ির সামনে নেমে বড়মামা বললেন, "আর কতক্ষণ বা সময় আছে, আটটার সময়চেম্বারে বসতে হবে, এদিকে এই আধহাত ফর্দ, কে সামলাবে!"

"আমি আর মাসিমা সোদপুর থেকে করে আনি।"

"ওই যে স্বর্ণ-সিংহাসন, বউবাজার ছাড়া পাচ্ছ কোথায়?"

"বড়মামা?"

ডাকটা মনে হয় বেশ জোরে হল। উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারছি না।

বড়মামা বললেন, "কী রে? অমন করছিস কেন?"

অদ্ভুত একটা কথা মনে হল। ভেতর থেকে কে যেন বলে দিল, ওই গুপ্তধনের ঘড়ায় একটা সোনার সিংহাসন আছেই আছে। সেই সিংহাসনে মায়ের কানের দুল বসবেন। ব্যাস, আর ভাবনা নেই। আগে গুপ্তধন উদ্ধার, তারপর দুল প্রতিষ্ঠা।

সামনেই মাসিমা। বেশ রাগ-রাগভাবে বললেন, "গিয়েছিলে কোথায়? থেকে থেকে যাও কোথায়? মাণিকের বাবার এখন-তখন অবস্থা। বেচারা সেই থেকে বসে আছে মুখ শুকিয়ে।"

বড়মামা মাসিমার খুব কাছে গিয়ে, ফিসফিস করে বললেন, "নব্বইয়ের আগে বুড়ো মরবে না, একশোতেও যেতে পারে। হাঁপানির রুগি সহজে মরে না।"

"তাহলেও একটা রিলিফ তো দিতে পারা যায়। দাঁড়াও, আমার ফাইনাল ইয়ার, একবার পাশ করে বেরুতে দাও, তোমার সব রুগি কেড়ে নোব!"

বড়মামা কম্পাউন্ডারকে নির্দেশ দিয়ে, মাণিকের বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। একটা ইনজেকশন, আবার মাসখানেক ঠিক থাকবেন বৃদ্ধ।

মাসিমা চা এনেছেন। বড়মামা চা খেয়ে চান করে সাদা প্যান্টের ওপর বুক খোলা টি-শার্ট পরে চেম্বার আলো করে চিকিৎসায় বসবেন। তখন বড়মামার অন্যরূপ। তখন কারুর একটার বেশি দুটো কথা বলার সাহস হবে না। তখন মেজমামা, মাসিমা সকলেই ভয় পাবেন।

বড়মামা মধুর স্বরে ডাকলেন, "কুসি।"

মাসিমা বললেন, "আবার কী হল? তোমার গলা শুনেই মনে হচ্ছে, কিছু গোলমেলে ব্যাপার।"

"বোস না, একটু বোস না, সব সময় অমন ধানিপটকার মেজাজে ঘুরিস কেন?"

"কী, বলো?"

মাসিমা বড়মামার চেয়ারের হাতলে বসলেন। বড় মধুর দৃশ্য। আমার মা-ও নেই, বোনও নেই। আমার আমি ছাড়া কেউ নেই।

বড়মামা বললেন, "বুঝলি কুসী, কাল এ-পরিবারের একটা দিনের মতো দিন, ডে অব অল ডেজ।"

"কেন? কাল আবার কী হল? পক্ষিরাজ কিনছ নাকি?"

মুখে রহস্য মেখে বড়মামা বললেন, "আমি একটা দুর্লভ জিনিস পেয়েছি। তার দাম? পৃথিবীকে গ্রহজগতের নিলামে চাপালেও হবে না। দুর্লভ, সুদুর্লভ, মহাদুর্লভ!"

"আঃ, বিশেষণ থামিয়ে দয়া করে বলো না, জিনিসটা কী?"

"মা-লক্ষ্মীর কানের দুল।"

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ডিসটেমপারড হয়ে গেছে। কালই চলো সাইকিয়াট্রিসট ডক্টর গাঙ্গুলির কাছে।"

"চেঁচাচ্ছিস কেন? ঘটনাটা শোন না। যে রাতে স্বপ্নে দেখলুম ছাদে ঠাকুরঘরের পাশে মা-লক্ষ্মী ইশারায় আমাকে ডাকছেন, তার পরের দিন সকালে বুড়ো দেখে কি, কী একটা চকচক করছে সেই জায়গাটায়। পড়ে আছে এক পাশে।

ব্যাপারটা কী হয়েছে বুঝলি? মা হলে কী হবে, মহিলা তো, অনেকটা তোর মতই। দেবলোক থেকে নরলোকে আসার পথে, তাড়াহুড়োয় আংটাটা ঠিকমতো লাগানো হয়নি, খুস করে খুলে পড়ে গেছে।"

"কই দেখি জিনিসটা কোথায়?"

"আমি আর হাত দোব না, রাস্তার কাপড়, চায়ের হাত, ওই আলমারিটা খলুলে কাঁচের একটা ট্রের মধ্যে আছে।"

মাসিমা উঠে গিয়ে আলমারি খুললেন। দুলটা দু'আঙুলে দোলাতে দোলাতে আমাদের কাছে এলেন, তারপর নিজের ডান কানে পরে নিয়ে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ, তুমি ঠিক বলেছ বড়দা, আমি মা-লক্ষ্মীর মতোই কেয়ারলেস। বুড়ো, তোকে আইসক্রিম খাওয়াব। থ্যাঙ্ক ইউ বড়দা।" মাসিমা চলে গেলেন।

মেজমামা বললেন, "তোমার সঙ্গে আমি হাত মিলিয়েছিলুম, সে কথা আমি অস্বীকার করছি না। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, নেতা কে হবে? সব কাজেরই একটা মেথড আছে। আমি খুঁড়তে শুরু করলুম উত্তরে, তুমি শুরু করলে দক্ষিণে, তা তো হয় না। এ একটা বিরাট কাজ। অনেকটা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মতো! মহেঞ্জোদারো-হারাপ্পার ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাই আমিই আমাকে নেত নির্বাচিত করলুম। তুমি আমাকে কখনোই যা করতে না, কারণ তোমার মধ্যে কোনও দিন আমি গণতান্ত্রিক নেতার সন্ধান পাইনি। তুমি যেন কাইজার উইলহেল্ম, তুমি যেন জার নিকোলাস ওয়ান, তুমি যেন লর্ড চেম্বারলেন—"

"আমি তো তোকেই নেতা করতে চেয়েছিলুম, তার আগেই তুই নরম-গরম, গরম-গরম কত কী বলে গেলি। এর থেকেই বোঝা যায় তুই আমাকে একেবারেই ভালবাসিস না।"

"ভাবাসি না? এই তোমার ধারণা? তা হলে শুনে রাখো, আমার প্রথম কবিতার বই তোমাকেই উৎসর্গ করেছি। কী লিখেছি জানো উৎসর্গপত্রে আমার পিতৃপ্রতিম বড়দাকে।"

"তাই নাকি, তা হলে ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই কথাটা ঠিক নয়।"

"সে এখন তুমি বুঝবে।"

"পাড়ার লোকে কী বলে জানিস, দুটি ভাই যেন রামলক্ষণ।"

মাসিমা বললেন, "গিন্নিবান্নিরা কী বলে জানো, সীতা কোথায়?"

"তোদেয় ওই এক কথা!"

মেজমামা বললেন, "শোনা বড়দা, ও সব কথা ছাড়ো, কাজের কথায় এসো। টিমটা আমি ঠিক করে ফেলেছি, আলোকসম্পাতে বুড়ো, মঞ্চসজ্জায় কুসি, রাত্রির প্রথম যামে শাবলে আমি, ঝুড়িতে তুমি, দ্বিতীয় যামে ঝুড়িতে আমি, শাবলে তুমি।"

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, "মঞ্চসজ্জাটা কী জানিস!"

"এই যেমন ধর চা দিলি, মাঝে মাঝে কফি সাপ্লাই করলি, কোকোও করে দিতে পারিস। লাইট স্ন্যাকস। হাতের কাছে জল, তোয়ালে, ফার্স্ট এড। মানে তোর ওপর খুব একটা চাপ পড়বে না, তবে ব্যবস্থাপনা বেশ ভাল হওয়া চাই।"

"তোমাদের এই পাগলামি ক'রাত চলবে?"

"বলতে পারছি না। তদ্দিন চলবে যদ্দিন না ঠ্যাং করে একটা আওয়াজ হচ্ছে।"

"স্বপ্ন নিয়ে এই বাড়াবাড়ি ঠিক হবে?"

"তুই জানিস, স্বপ্নে গ্লুকোজের ঠিক ফর্মুলা পাওয়া গিয়েছিল? মলিকিউলের গঠন? স্বপ্নে কত কী পাওয়া গেছে জানিস? কবিতায় পড়িসনি? স্বপ্নে কুললক্ষ্মী এসে মাইকেলকে বলেছিলেন, বাছা, ইংরাজি নয়, বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করো।"

মাসিমা বললেন, "তোমাদের দেখে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে সাধকপ্রেমিকের সেই গানটা গাই, হতেছে পাগলের মেলা খেপাতে খেপিতে মিলে। শুধু শব্দটা পালটে খেপা বসাতে হবে।

মাসিমা চলে গেলেন। সামনে পরীক্ষা। খুব পড়ার চাপ। এর ওপর গুপ্তধনেব উৎপাত। মেজমামা বললেন, "বড়দা, গুপ্তধন খুঁড়ে বের করার আগে একটা প্ল্যান তৈরি করতে হয়। তোমার কাছে গোয়ালঘরের নকশা আছে?"

"গোয়ালের আবার নকশা? কে কবে তৈরি করে গোরু রেখেছিল সেই থেকে চলে আসছে।"

"তা হলে আমাদের ফার্স্ট কাজ হবে গোয়ালের একটা ডিটেল্‌স্‌ তৈরি করা। তুমি গোয়ালে কোনও দিন ঢুকেছ?"

"কতবার।"

"আমি একবারও ঢুকিনি। বিশ্রী বোটকা গন্ধ—"

"তা কেন ঢুকবে? তুমি হলে ভাই সুখের পায়রা। দুধ খাবে, দধি খাবে, গন্ধটি সহ্য করবে না।"

"সে হল গিয়ে যার যেমন বরাত। আচ্ছা গোয়ালটার আগাপাশতলা কি তুমি দেখেছ ভাল করে? কোথায় কী আছে না-আছে?"

"সেই গোয়েন্দার চোখে কোনও দিন দেখা হয়নি। আরে ম্যান, গোরু আগে না গোয়াল আগে!"

"শোনো, কাল আর্লি মর্নিং-এ আমরা গোয়াল সার্ভে করতে যাব। ইতিমধ্যে সার্ভে কীভাবে করতে হয় আমি পড়ে রাখছি।"

"শুনেছি থিওডোলাইট না কী সব যেন লাগে।"

"ধর, অতসবের দরকার নেই। আসল কথা হল খুঁড়ে যাও। একটা কবিতার প্রথম দুটো লাইন লিখে ভীষণ আটকে গেছি, পরের দুটো লাইন পেয়ে গেলে এই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতুম এখুনি।"

"বল না, লাইন দুটো বল না, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি।"

"ভাবটা খুব দার্শনিক ধরনের, বুঝলে,

রাতের আকাশে শুকতারা জ্বলে

গাঁয়ের শ্মশানে চিতা।"

"বাঃ, এ যে দেখছি একেবারে শেষের কবিতা। তুমি এটাকে এখন কোথায় নিয়ে যেতে চাইছ?"

"আর একটা লাইন টপকে দিয়ে, এমন একটা লাইনে শেষ করতে হবে, যার শেষ শব্দ চিতার সঙ্গে মিলে যাবে।"

"তার মানে চিতার সঙ্গে মেলাতে হবে? ছাইয়ে তা হলে চলবে না!"

"নাঃ, ছাই-ফাই চলবে না। সেইটাই তো সমস্যা রে দাদা।"

"চিতার সঙ্গে কী মেলে? মিতা। চিতাই মোদের মিতা।"

"কোন্ যুগে পড়ে আছ তুমি ? এইটুকুতে তুমি আমন একটা লাইন ভাবতে পারলে ?"

"দাঁড়া দাঁড়া, এসে গেছে, একেবারে আলট্রা মডার্ণ লাইন, শোন তাহলে, পুরোট কী দাঁড়াচ্ছে,

রাতের আকাশে শুকতারা জ্বলে
গাঁয়ের শ্মশানে চিতা
তোমার আমার ভুঁড়ি বেড়ে চলে
মাপিতে পারে না ফিতা ॥

"বল কেমন হল ?"

"একসেলেণ্ট একসেলেণ্ট !"

"অর্থটা কী মারাত্মক হল জানিস ? মৃত্যুতেই মানুষের শেষ। হবেই হবে, তবু আমরা গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে ভুঁড়ি বাগিয়ে চলেছি।"

"কমাল কর দিয়া ম্যান। মানুষের কান মুলে ছেড়ে দিয়েছ।"

মেজমামা নিজের ঘরে চলে গেলেন। বড়মামা বললেন, "লোকটাকে এখনও ঠিক চিনতে পারলুম না।"

"কার কথা বলছেন বড়মামা ?"

"তোমার ওই মেজমামা।"

"মেজমামাকে লোক বলছেন ?"

"কেন, ও লোক নয় ?"

"হ্যাঁ, লোক, তবে ভদ্রলোক বললে ভাল হয়।"

"আরে রাখ, নিজের ছোট ভাই আবার ভদ্রলোক ? তোকে আরও কয়েকদিন গুপ্তচরবৃত্তি করতে হবে। প্রফেসারকে বিশ্বাস নেই। সব না বানচাল করে দেয় !"

"উনি তো ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে দিলেন।"

"জানলা তো খোলা আছে।"

"তা আছে !"

ছাদের দিকে জানলায় পাতলা পর্দা ঝুলছে। ঘরে শেড লাগানো টেবলে ল্যাম্প ঝুলছে। ঝুলছে কেন ? এ বাড়ির সবই অদ্ভুত। টেবিলে ল্যাম্প রাখার জায়গা নেই। অসাধারণ উপায়ে সেটাকে দেয়ালের হুকের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

মেজমামা টেবিলে একবার করে তাল বাজাচ্ছেন আর খাতায় একটু একটু লিখছেন। বীরেরা তাল ঠুকে যুদ্ধ করে, ইনি তাল ঠুকে লিখছেন। বড় বড় লোকের বড় বড় ব্যাপার। আমার খুব মজা লাগছে। আড়াল থেকে মানুষকে নজরে রাখলে অনেক কিছু জানা যায়! যেমন লেখার তাল আছে। পেনসিল শুধু ছোটরাই চিবোয় না। বড়রা বড় জিনিস চিবোয়, যার দাম আরও বেশি, পার্কার কলম। লিখতে গেলে মাঝে মাঝে মাথা চুলকোতে হয়। এদিকে-ওদিকে তাকাতে হয় বোকার মতো। মাথায় ভাল কিছু এসে গেলে শরীর আর মাথা দোলাতে হয়।

মেজমামাকে দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে, কবিতা লেখা ভীষণ কঠিন কাজ। এক সময় তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ঘরে একটা স্টিল আলমারি রয়েছে। আলমারিটা খুললেন। লোহার পাল্লা ঝনঝন করে উঠল। মেজমামা নিচু হয়ে একেবারে তলার খোপ থেকে কী একটা বের করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। হাতে একটা পুরনো খাতা। ফিতে দিয়ে বাঁধা।

টেবিল ল্যাম্পের তলায় খাতাটা ফেললেন। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে পাঁপড় ভাজার মতো হয়ে গেছে। মেজমামা খাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ওপাশে খুট করে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠলেন। খাতাটাকে লুকোবার চেষ্টা করলেন।

তার মানে? এ খাতা তেমন নিরীহ খাতা নয়। ওর পাতায় পাতায় অবশ্যই কোন গুপ্ত তথ্য আছে। গুপ্তধনের পেছনে এই রকম সব গোপন দলিল থাকে। খবরটা আমার 'বস'-কে দিতে হচ্ছে। বড়মামাকে বস বলতে বেশ মজা লাগল!

বড়মামা সব শুনে বললেন, "অ্যাঁ, বলিস কী, খুব পুরনো খাতা! অনেকটা ডায়েরির মতো! তা হলে কি, তা হলে কি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হলে সেই।"

"তার মানে কী সেই?"

"সেই বইয়ে যেমন পড়ি, ওর মধ্যে কোনও রহস্য আছে, কবিতা নেই।"

"ঠিক বলেছিস। কবিতা হল একটা মুখোশ। ও মনে হয় কোনওভাবে আমাদের পূর্বপুরুষ প্রসন্নকুমারের ডায়েরিটা খুজে পেয়েছে। তখন সারা বাংলায় বর্গির হাঙ্গামা চলছে। যার যা

ধনসম্পদ সব পুঁতে রাখছে মাটির তলায় গোপন জায়গায়। ডায়েরিতে লিখে রাখছেন সন্ধানের নির্দেশ নিজের জন্য, উত্তরপুরুষের জন্যে। শুনেছি প্রসন্নকুমারের অনেক কিছু ছিল।"

"তিনি কে ছিলেন বড়মামা?"

"দাঁড়া, গুনে বলি, প্রপ্রপ্রপিতামহ। দেখ তো ঠিক হল কি না? পিতার পিতা—পিতামহ, তস্য পিতা—প্রপিতামহ, তস্য পিতা—প্রপ্রপিতামহ, তস্য পিতা—প্রপ্রপ্রপিতামহ, ক'পুরুষ হল বল তো?"

বাবা! এ যে দেখি আর এক গুপ্তধন!

রাতে মেজমামা ঘোষণা করলেন, "আজ আর আমি খাব না। নো মিল। পেটের টিউনিং ঠিক নেই। একদিন অফ করে দি।"

মাসীমার ডাকে ঘরের ভেতর থেকেই বললেন। দরজা খুললেন না। মাসিমার পাশে দাঁড়িয়ে বড়মামা বললেন, "কী হচ্ছে বলো, একটু ওষুধ দিয়ে দি।"

"না না, ওষুধ কী হবে? কথায় কথায় ওষুধ! মাসে, মাসে, উপবাসে।"

"আরে দূর, কারটা কার ঘাড়ে চাপাচ্ছ? ওতে জ্বর সারে, পেটের জন্যে দাওয়াই লাগে। হজমি, অথবা অ্যান্টাসিড।"

মেজমামা বললেন, "মুড়ি আর ভুঁড়ি।"

বড়মামা বললেন, "আঃ, আবার ভুল বললে! ওটা হল শরীরের যোগাযোগের কথা। পেটের সঙ্গে মাথা, মাথার সঙ্গে পেটের যোগ।"

মেজমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, "আঃ, ডোণ্ট ডিসটার্ব।"

আমরা খাবার টেবিলে বসতেই বড়মামা বললেন, "একেই বলে, বিষয় বিষ, বুঝলি কুসি। আধঘণ্টার মধ্যেই ছেলেটার স্বভাব কী রকম পালটে গেল! চোখে পড়ার মতো।"

মাসিমা বললেন, "খাচ্ছ খাও, তোমাকে আর কারুর সমালোচনা করতে হবে না। বিষয়ের কী দেখলে তুমি?"

"অ্যা, বলিস কী! প্রসন্নকুমার কত লক্ষ কত কোটি টাকা মাটি তলায় পুঁতে রেখে গেছেন, তোর ধারণা আছে!"

"হঠাৎ সেই পূর্বপুরুষকে ধরে টানাটানি কেন? তিনি ছিলেন সাধক মানুষ। সমাধি পেয়েছিলেন। সমাধির ওপর সেই বুড়ো

বকুলে আজও ফুল ফোটে। পাঁজিতে জন্মদিন, মৃত্যুদিন লেখা হয়। কত বড় বৈষ্ণব ছিলেন তিনি!"

"আজ্ঞে না, সব দান করে দিয়েছিলেন।"

"তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না, বর্গির হাঙ্গামার সময় সব পুঁতে ফেলেছিলেন মাটিতে।"

"আজ্ঞে না, সব দান করে দিয়েছিলেন।"

"তর্ক না করে তাঁর জীবনীটা পড়ে দেখ।"

"কোথায় পাব?"

"মেজদার কাছে পাবে। মেজদা রিসার্চ করছে, বৈষ্ণব আন্দোলন ও প্রসন্নকুমার।"

খাওয়া শেষ হল। বড়মামা মেজমামার ঘরে গিয়ে টুকটুক করে টোকা মারলেন। ভেতর থেকে কেমন যেন একটা গলা ভেসে এল, "এখন আমাকে বিরক্ত না করলেই সুখী হব।"

বড়মামা বললেন, "কার গলা বল তো! ডক্টর জেকিলের, না মিস্টার হাইডের?"

"কারুর গলাই যে আমি শুনিনি বড়মামা!"

"তোর কল্পনাশক্তি বড় কম। না দেখলে না শুনলে তোর মাথায় কিছু আসে না। পরি কেউ কোনও দিন দেখেছে! ছবি এঁকেছে। নিয়তির গলা কেউ শুনেছে! যাত্রায়, থিয়েটারে সেই না শোনা গলাই অনুকরণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ যে কম্বুকণ্ঠে কথা বলতেন, মানুষ শুনে জানেনি, জেনে শুনেছে।"

আমরা আমাদের ঘরে ফিরে এলুম। গুপ্তধন নিয়ে আর মাথা ঘামাতে ভাল লাগছে না। বড়মামা মোটা একটা ডাক্তারি বই নিয়ে বসেছেন। বড়মামার এই এক গুণ দেখেছি, কোন কিছুতে একবার ডুবে গেলে আর জ্ঞান থাকে না। আমারও একটা গুণ আছে। একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর জ্ঞান থাকে না। কোথায় কোন্ জগতে যে চলে যাই।

মনে হয় গভীর রাত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বড়মামা ঠেলছেন। ঠেলতে ঠেলতে প্রায় খাটের ধারে এনে ফেলছেন। শরীরের একটা অংশ ঝুলে পড়েছে। চাঁদের আলোয় চারপাশ ফুটিফাটা।

"ওঠ ওঠ, উঠে পড়।"

"অ্যাঁ, কী হল বড়মামা, আবার স্বপ্ন?"

"ধ্যাত, এবার দঙ্গবপু। শিগগির নীচের বাগানে চল। আমার মনে হচ্ছে, মেজ গোয়ালে গিয়ে ঢুকেছে। গোরুটা যেন ভেও করে ঢেঁকুর তুলল।"

এই অসময়ে আমার আর নীচে নামতে ইচ্ছে করছে না। বড়মামাকে থামাবার জন্যে বললুম, "দুপুরে চরতে বেরিয়েছিল। মনে হয় খুব গুরুপাক খাওয়া হয়ে গেছে, তাই বদহজম হয়েছে।"

"হ্যাঁ রে ব্যাটা গোবদ্যি, তুই সব জেনে বসে আছিস! গোরু কি মানুষ, যে বদহজম হবে। ফাঁকিবাজ। চল, নীচে চল। আমার একা যেতে ভীষণ ভয় করছে।"

উঠতেই হল। দু'জনরেই ভীষণ ভয়। বড়মামা যদি আমাকে একা ফেলে রেখে চলে যান, থাকতে পারব না। বাগানে নেমে অবাক হয়ে গেলুম। আমরা যখন ঘুমোচ্ছিলুম, সেই ফাঁকে কত ফুল ফুটেছে। চারপাশ সাদা হয়ে আছে। গোয়ালঘর জমাট অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। কেউ কোথাও নেই। গোরুর নিশ্বাস পড়ছে ফোঁস ফোঁস করে।

বড়মামামা বললেন, "এই নে টর্চ। গোয়ালের ভেতরটা একবার দেখে আয় তো, কেউ আছে কি না।"

"ওরে বাবা, আমি পারব না বড়মামা, কামড়ে দেবে।"

"কে কামড়াবে?'

"গোরু।"

"গোরু কামড়ে দেবে?" বড়মামা হোহো করে হেসে উঠলেন, "কোন্ বইয়ে পড়েছিস, গোরু কামড়ায়!"

"আপনি যাচ্ছেন না কেন বড়মামা!"

"সত্যি কথা বলব? ছোটদের মিথ্যে বলতে নেই। আমারও একটু ভয় ভয় লাগছে রে! বলা যায় না, যদি কিছু থাকে!"

"কী আর থাকবে?"

"তোমার মেজমামা থাকতে পারে।"

"পারে কেন, আছে। তবে গোয়ালে নেই। আছে এই কাঁঠালতলায়।"

বাজ পড়লে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, আমরা দুজনে ঠিক সেই রকম চমকে উঠলুম। মেজমামার গলা। বড়মামা বললেন, "বিশ্বাসঘাতক।"

"কে, তুমি না আমি ?"

"তুমি।"

"যদি বলি তুমি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার না বলেই নীচে নেমে এসেছে, আমার গতিবিধির ওপর চোখ রাখার জন্যে।"

"সে তো কিছু ভুল করিনি।"

"ভুল অবশ্যই করেছে। তুমি পরীক্ষায় ফেল করেছ। গোল্লা পেয়েছ। আমার পাতা ফাঁদে পা দিয়েছ।"

"ফাঁদ মানে ?"

"ফাঁদ মানে ট্র্যাপ। তুমি আমাকে কতটা বিশ্বাস কর দেখার সঙ্গে নীচে নেমে এসে একটু শব্দ-টব্দ করেছিলুম। যা ভেবেছিলুম তাই। সুড়সুড় করে নেমে এলে। বড়দা, একেই বলে বিষয় বিষ।"

"এত বড় একটা কথা বললি, বিষয় বিষ! যাঃ তোকেই দিয়ে দিলুম। তোকে স্বপ্ন দিলুম, গুপ্তধন দিয়ে দিলুম, সব দিয়ে দিলুম, এমন কী আমার কৌতূহলটা পর্যন্ত দিলুম। সব তোর।"

বড়মামা হাত চেপে ধরে বললেন, "চল ওপরে চল। আমরা এখন মুক্ত পুরুষ।"

মেজমামা বললেন, "স্টপ। এদিকে এসো। দুজনেই এগিয়ে এসো।"

এতক্ষণ মেজমামার গলাই শুনছিলুম। চোখে দেখা যাচ্ছিল না। অন্ধকারে আলোর খেলা চলেছে। গাছের পাতা রূপকথার রূপোর পাতার মতো ঝিলমিল করছে! সবচেয়ে সুন্দর হয়ে সেজে উঠেছে তাল, সুপারি, খেজুর আর নারকেল গাছ।

বড়মামা বললে, "অন্ধকারে, তুমি আজ কোথায় ?"

কাঁঠাল গাছের তলায়, একটা ছায়া দুলে উঠল, স্বর ভেসে এল, "খুব কাছেই। এটাও তোমার একটা শিক্ষা হল।"

"কী শিক্ষা ?"

"হৃদয়ে অন্ধকার জমে থাকলে মানুষ চেনা যায় না দাদা। মানুষ চিনতে হলে আলো জ্বালতে হয়। হৃদয়ের আলো। কাঁঠালতলায় এসো, খবর আছে।"

আমরা দু'জনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। চাঁদের আলোয় পাতার ছায়া পড়ে, সে যেন আর এক স্বপ্ন! দূরে ফাঁকা মাঠে ঝলমল করছে আলো। তাকালেই মনে হচ্ছে, এক্ষুনি পক্ষিরাজ

নেমে আসবে। পিঠে রাজপুত্র। কাঁঠালতলায় একটা বড় পাথর পড়ে ছিল, তার ওপর মেজমামা বসে আছেন, দু'হাঁটুতে হাত রেখে আরাম করে। আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, "টর্চ জেবলে অন্ধকারকে বিরক্ত কোরো না। দু'জনে বোসো। ওই যে আরও দুটো পাথর রয়েছে।"

বড়মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, "তুমি আমাদের নিয়ে কী করতে চাইছ? আমরা দু'জনেই কিন্তু নিরস্ত্র!"

"আমিও তাই।"

"তোমার গলটা কেমন যেন ভিলেনর মতো শোনাচ্ছে, অনেকটা করালীচরণের মতো।"

"তুমি করালীচরণের গলা শনেছ?"

"ঠিক শুনিনি; কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে কানের কাছে ভাসছে।"

"হৃদয়ের শব্দ শুনতে পাওনি, তাই কানের কাছে করালী।"

"বলো কী, রোজ আমি স্টেথো ফেলে ডজন ডজন হৃদয়ের শব্দ শুনি!"

"সে সব অসুস্থ হৃদয়। নিজের হৃদয়ের আসল শব্দ শোনার চেষ্টা করো। বড় অন্ধকার, বড় বেসুরো। বোসো, বোসো।"

আমরা বসলুম, দু'জনে দুটো পাথরে। সত্যিই মেজমামাকে কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে। রহস্যময়। মেজমামা বললেন, "আচ্ছা দাদা, ক-এ কী হয়?"

"ক-এ কলতলা।"

"ক-এ কাঁঠালতলা হলে আপত্তি আছে?"

"না। তবে তুমি বলেছিলে কলতলা।"

"আচ্ছা দাদা, খ-এ যদি খড়ের বদলে খরগোশের গর্ত হয়, তোমার আপত্তি হবে?"

"না, হতে পারে।"

"তা হলে ক খ গ ঘ যদি এই রকম হয়, কাঁঠালতলায় খরগোশের গর্তে খড়গ, তা হলে কেমন হয়!"

"কিন্তু গোয়ালে তা হলে কী হবে?"

"গোয়ালটা গোরুকে ছেড়ে দাও। অবোধ জীবটিকে শান্তিতে, মশার কামড়ে থাকতে দাও।"

"বেশ, তাই হোক।"

"দেখি টর্চটা দাও।"

মেজমামা বড়মামার হাত থেকে টর্চ নিলেন, "নাও, এইবার দ্যাখো।"

মেজমামা টর্চের বোতাম টিপলেন। আলোর রেখায় কিছু দূরে একটা গর্ত দেখা গেল।

"দাদা! কী দেখছ, এই সেই গর্ত!

"কিন্তু খরগোশ আসে কোথা থেকে?"

"খরগোশ আসার তো দরকার নেই। এই রহস্যে গর্তটাই বড় কথা, খরগোশটা নয়।"

"তা হলে?"

"আর প্রশ্ন নয়, গর্ত ইজ এ ক্লিয়ার প্রুফ অব আওয়ার গুপ্তধন। লেট আস স্টার্ট।"

"রাতের বেলায় গর্তে খোঁড়াখুড়ি না করাই ভাল। বলা যায় না, সাপখোপের ব্যাপার থাকতে পারে।"

"দেখ দাদা, ভয় পেলে মানুষের কিছু হয় না। সাহস চাই, সাহস। তুমি টর্চটা ধরো, আমি শাবল চালাই। আমার সে সাহস আছে।"

"কাল সকালে করলে হত না ভাই!"

"সকালে? গুপ্তধন কেউ কোনও দিন সকালে, সবার সামনে খোঁজে? গুপ্তধন গোপনে, রাতের অন্ধকারে অনুসন্ধানের জিনিস। বিপদের ঝুঁকি থাকবে, বাধা থাকবে, ভয় থাকবে, মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকবে। এ তো তাই, ময়রার দোকানের মোয়া নয়। অতএব আজই এখনই। জয় মা।"

মেজমামা নিচু হয়ে পায়ের কাছ থেকে যে জিনিসটি তুলে নিলেন, সেটি একটি বড় সাইজের শাবল। চাঁদের আলোয় শাবল হাতে মেজমামা। কেমন যেন দেখাচ্ছে! গুপ্তধন সত্যিই কি আছে? দিনের বেলায় বিশ্বাস হয় না। রাতের বেলায় ভাবলে গা ছমছম করে।

মেজমামা বললেন, "বলো, ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ।"

আমরা বললুম, "ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ।"

একটা প্যাঁচা ডাকল। প্যাঁচার ডাক নিশ্চয়ই শুভলক্ষণ।

মা-লক্ষ্মীর বাহন বার-তিনেক চ্যাঁ-চ্যাঁ করে ডাকল। সেই ডাকের সঙ্গে ডাক মিলিয়ে মেজমামা ডাকলেন—জয় মা। তারপর গর্তে মারলেন শাবলের খোঁচা। খোঁচা মারার সঙ্গে সঙ্গে ঝম করে একটা শব্দ হল।

"মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পিছিয়ে এলেন। বড়মামাকে বললেন, শুনলে, কিছু শুনতে পেলে?"

বড়মামা বললেন, "কে যেন টাকার তোড়া নাচাল!"

"রাইট। অ্যাবসলিউটলি কারেকট। দাঁড়াও, আর একবার শাবল চালাই।"

মেজমামা নাচের ভঙ্গিতে আর একবার শাবল চালালেন, এবার ঝমঝমাঝম করে অদ্ভুত একটা শব্দ হল। শুধু শব্দ নয়, গর্তের মুখে কী একটা বেরিয়ে এসে আবার ভেতরে ঢুকে গেল।

বড়মামা বললেন, "বুঝলি, মনে হচ্ছে মোহরের থলে।"

মেজমামা বললেন, "রাইট ইউ আর, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। দাঁড়াও, বেরিয়ে আসতে ভয় পাচ্ছে। টেনে বের করে আনি।"

মেজমামা হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, "ফোকাস, ফোকাস,।"

আমার হাতের টর্চ ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়ল। মেজমামা গর্তে শাবল চালিয়ে কিছু একটা সামনের দিকে টেনে আনতে চাইলেন। তালগোল পাকিয়ে কী একটা বেরিয়ে এল। মেজমামা 'ইউরেকা' বলে চিৎকার করে উঠলেন। বড়মামা, আমার 'স্বপু, আমার স্বপু' বলে জিনিসটাকে ধরতে গেলেন।

ঝম করে একটা শব্দ হল। গুপ্তধনের চারপাশে কাঁটা উঠল খোঁচা-খোঁচা হয়ে। বড়মামা ভয়ে পিছিয়ে এলেন।

"কী বল তো জিনিসটা?"

মেজমামাও সবে এসেছেন। বড়মামার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন। আলোর তেজ ক্রমশই কমে আসছে। মেজমামা বললেন, "পরক্যুপাইন!"

বড়মামা বললেন, "তার মানে শজারু।"

"ইয়েস।"

কাঁটা-খোঁচা শজারু, নড়েও না, চড়েও না, গর্তের মুখ আগলে বসে আছে। বড়মামা বললেন, "এটা মনে হয় ছদ্মবেশী যক্ষ।"

মেজমামা বললেন, গুপ্তধনের মুখে অনেক বাধা থাকে, আমাদের

সুবিধের জন্যে, সব বাধা, বাধার তাল হয়ে কাঁটা উঁচিয়ে সামনে বসে আছে। মায়ের কী দয়া বলো তো। বলো, 'জয় মা!' হেঁকে বলো।"

মেজমামা শাবল তুলে আবাব যেই গর্তের দিকে এগোতে গেছেন, শজারু উলবোনা কাঁটার বলের মতো লাফিয়ে উঠল। বড়মামা একসঙ্গে বললেন, "জয় মা, সাবধান!"

গোলমাল বেশ ভালই হয়েছে মনে হয়, তা না হলে মাসিমা ঘুম ভেঙে উঠে আসবেন কেন? মাসিমা এসে বললেন, "তোমাদের ঘুম নেই? রাতেও পাগলামি? তোমাদের জন্য এবার দেখছি বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে। এ কী, এটা আবার কী?"

বড়মামা ভালমানুষের মত বললেন, "আমাদের গুপ্তধন।"

মাসিমা ঝুঁকে পড়লেন সামনে, "ও মা, এ তো সেই শজারুটা। ক'দিন হল আমাদের বাগানে এসে বাসা বেঁধেছে। ওটাকে টনেটুনে গর্ত থেকে বের করছে কেন? ওর বাচ্চা হয়েছে। তোমাদের কি খেয়েদেয়ে আর কোনও কাজ নেই। যাও, বাড়ি যাও।"

মেজমামা বললেন, "দাদা!"

বড়মামা বললেন, "ভাই।"

মাসিমা বললেন, "হ্যাঁ, দাদা, ভাই, ভাগনে, তিনজনেই আর একটুও কথা না বাড়িয়ে সোজা যে-যার ঘরে। ভোর হয়ে আসছে। উঃ, দেখেছ, কী কাণ্ড, একেবারে শাবল-টাবল এনে মনের আনন্দে। জানে তো, কুসি এখন ঘুমোচ্ছে!"

বড়মামা বললেন, "মেজো, গোয়ালটা একবার উসকে দেখলে হয় না? থাকলেও থাকতে পারে। মনে আছে কতকাল আগে আমরা পড়েছিলুম,

যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ ভাই
মিলিলেও মিলিতে পারে
পরশপাথর ॥"

"দ্যাটস রাইট, দ্যাটস রাইট।"

কাঁঠাল গাছের তলা থেকে মাসিমার গলা পাওয়া গেল, "মেজদা তোমার এই সুটকেসে কী আছে? এখানে ফেলে গেলে কেন?"

"আমার সুটকেস? আমার আবার সুটকেস আসবে কোথা থেকে? কই দেখি?"

. অবার আমরা কাঁঠালতলায়। শজারু গর্তে ফিরে গেছে। মেজমামা যে পাথরে বসেছিলেন, চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়ায়, সেখানে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে। পাথরের পাশে ঝকঝক করছে ছোট্ট একটা অ্যালুমিনিয়ামের সুটকেস। এইমাত্র কেউ যেন রেখে উঠে গেছে।

মেজমামা বললেন, "একটু আগেও এটা এখানে ছিল না।"

বড়মামা বললেন "আর ইউ শিওর?"

"ডেড শিওর।"

"তা হলে এটাকে খোলা যাক। আমার মনে হয় এর মধ্যে আমাদের জন্যে স্পেশ্যাল কোনও খবর আছে। গুপ্তধন মানুষকে এইভাবেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটিয়ে নিয়ে যায়।"

মাসিমা কাঠকাঠ গলায় বললেন, "ভেতরে চলো! মনে হচ্ছে কিছু আছে।"

রহস্য-উপন্যাসের মতো দৃশ্য। বিশাল উঠোনে এ বাড়ির কোনও পূর্বপুরুষ একটা বেদী তৈরি করে রেখেছিলেন। পাথর বাঁধানো। সেই বেদীতে আমরা বসে আছি। মাথার অনেক ওপরে চৌকো আকাশ। ভোর হয়ে আসছে। বেশ একটা হিম-হিম ভাব।

মেজমামা বললেন, "কখন সুটকেসটা খুলবি রে কুসি?"

"ধৈর্য ধরো।"

বড়মামা বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধৈর্য মানুষের একটা বড় গুণ, ধৈর্য ছাড়া কিছু হয় না।"

মাথার ওপর শেষ তারাটি মিলিয়ে গেল। একটা দুটো পাখি ডাকছে। মেজমামা বললেন, "আর কতক্ষণ ধৈর্য ধরাবি কুসি?"

মাসিমা বললেন, "আলো ফুটুক।"

বড়মামা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আলো আলো। আলো ছাড়া কিছু হয় না।"

পাখিদের শোরগোল পড়ে গেছে। মেজমামা বললেন, "তোর ব্যাপারটা কী বল তো কুসি? এভাবে ঝুলিয়ে রাখছিস কেন বোন?"

"তোমাদের একটু শিক্ষা হোক।"

বড়মামা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সব বয়সই শিক্ষার বয়েস। শেখার কোনও বয়েস নেই।"

সদরে একটা শব্দ হল। এইবার একে একে সব আসতে আরম্ভ করবে। কাজের লোক। বাড়িতে শোরগোল পড়ে যাবে। সবশেষে আসবেন সাইকেল চেপে কমপাউণ্ডবাবু। এসেই চা চা করবেন।

প্রথমেই যে এল, সে হল মোক্ষদার নাতি। ছোট্ট এতটুকু ছেলে, ফুলো ফুলো গাল। চোখে ঘুম লেগে আছে। পরনে হাফ প্যাণ্ট, গেঞ্জি। গত বছর ছেলেটির বাবা মারা গেছেন। মাসিমাই মানুষ করছেন বলা চলে। ওষুধ, পথ্য, জামাকাপড়, অল্পস্বল্প লেখাপড়া শেখানো। সারাদিন এ বাড়িতেই থাকে। বড় শান্ত ছেলে।

মাসিমা ডাকলেন, "শঙ্কর, এদিকে এসো।"

মেজমামা বললেন, "তোর মতলবটা কী বল তো কুসি?"

মাসিমা কথা কানে তুললেন না। শঙ্কর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মাসিমা বললেন, "কান ধরো। দু'কান।"

ভাল মানুষ শঙ্কর আদেশ পালন করল। মাসিমা বললেন, "তুমি এটা কাল বাগানে ফেলে গিয়েছিলে?"

শঙ্কর ঘাড় নাড়ল। দুই মামা বললেন "যাববাবা, শুধু শুধু তুই বসিয়ে রাখলি!"

দু'জনে উঠতে যাচ্ছিলেন। মাসিমা বললেন, "বোসো, শুধু শুধু নয়। এইবার আমি বাক্স খুলব। সত্যিই এত গুপ্তধন আছে। এই দ্যাখো।"

ছোট একটা স্লেট, পেনসিল, আর প্রথমভাগ। মাসিমা প্রথম ভাগের পাতা খুলে ভোরের আলোয় মেলে ধরলেন। "নাও পড়ো। দুজনেই পড়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।"

দুই মামা সমস্বরে পড়লেন, "ক খ গ ঘ।"

"কেমন লাগছে পড়তে?"

দুজনেই বললেন, "ফাসক্লাস! আর একবার পড়ি। কী সন্দর! ক খ গ ঘ। উঃ, মনে হচ্ছে শৈশব আবার ফিরে এসেছে। দাদা?"

"ভাই।"

"বুঝলে কিছু? কুসি কী বোঝাতে চাইলে, বুঝলে?"

"না রে ভাই।"

"মোটা মাথা।"

"অ্যাঁ।"

"হ্যাঁ। কিঞ্চিৎ গবেট। গুপ্তধন হল কখগঘ। বর্ণ পরিচয়। আর গুপ্তধন, আমাদের শৈশব।"

"আরে হ্যাঁ. তাই তো, তাই তো।"

"তা হলে বুঝলে, মা-লক্ষ্মী আসেননি। এসেছিলেন মা-সরস্বতী।"

"বীণা! হাতে তো বীণা ছিল না ভাই।"

"তুমি গবেট। মা কি তোমাকে বাজনা শেখাতে এসেছিলেন? মা এসেছিলেন মানুষের জীবনের গুপ্তধনের সন্ধান দিতে!"

"আর ইউ শিওর?"

"ডেড শিওর। মায়ের হাতের বীণা, আর মায়ের পায়ের প্যাঁচা সরিয়ে নিলে, তুমি বলতে পারবে, কে লক্ষ্মী কে সরস্বতী?"

"না।"

"সব এক, সব একাকার।"

"তা হলে তুমি বলছ, জ্ঞানের সন্ধানই গুপ্তধনের সন্ধান।

"ইয়েস"

"মা সেই কথাই বলে গেলেন?"

"ইয়েস।"

"তা হলে কুসি, চা বানাও, আজ কী আনন্দ, কী আনন্দ!"

ভোরের আলোয় শঙ্কর দুলে দুলে আধো-আধো গলায় পড়ছে, ক খ গ ঘ।

আট

হাড়ের নস্যির ডিবে। আগে কখনো দেখিনি। পুরী থেকে স্পেশাল আমদানি। বড় মামার এক রোগী পুরী থেকে এনে প্রেজেন্ট করেছে, পুরস্কার। ভদ্রলোক একদিন বেদম হাসছিলেন। চোয়াল আটকে হাঁ হয়ে গেল। কোনো ডাক্তারেই কিছু করতে পারে না। শেষে বড়মামা। বড়মামা সেই সময় বাড়িতে সিল্কের লুঙ্গি পরে পেয়ারের কুকুর লাকিকে ওঠ-বোস করাচ্ছিলেন। ভদ্রলোক হাঁ করে রিক্সা থেকে নেমে এলেন। ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে বড়মামাও হাঁ। ভদ্রলোকের বাড়িতে সেদিন মাংসের ঝোল

হয়েছিল। চোয়াল আটকে গেলে-খাওয়া যায় নাকি? দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। ঝোল জুড়িয়ে জল। এখন শেষ ভরসা বড়মামা।

লাকিও ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে হাঁ। আশে-পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও হাঁ। বড়মামা মিনিট খানেক কি ভাবলেন! তারপর ঠেসে এক চড় ভদ্রলোকের গালে। খুট্ করে একটা শব্দ হল। ভদ্রলোকের চোয়ালে নিমেষে খুলে গেল। এক মুখ হাসি। বড়মামাকে জড়িয়ে ধরে সে কি আদর! বড়মামা যত বলেন, 'ছাড়ুন ছাড়ুন, কাতুকুতু লাগছে,' আদর যেন ততই বেড়ে যাচ্ছে! শেষে লাকি যখন রাগে গড় গড় করে উঠল, ভদ্রলোক তাঁর উচ্ছ্বাস সংযত করলেন।

'মশাই, পাঁচকড়ি বসে বসে তারিয়ে তারিয়ে আমার মাংস আমারই চোখের সামনে খেয়ে যাবে, বলুন সহ্য করা যায়!' পাঁচকড়ি ভদ্রলোকের বেকার ভাই। বড়মামা বললেন, 'আজকের দিনটা লিকুইড় খেলেই ভাল হয়।' 'লিকুইডই তো, মাংসের ঝালটাই তো বেশি, পাঁচশো মাংস আর ক'টা টুকরো বলুন। ঝালের সঙ্গেই গিলে নেবো।' কড়কড়ে আটটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়েই পাঁচকড়ির দাদা সাতকড়ি রিক্সায় উঠলেন। চড় মারার ফল। সেই সাতকড়িবাবুই নস্যির ডিবেটা দিয়েছেন।

নস্যির ডিবেটা সিল্কের লুঙ্গি দিয়ে পালিশ করতে করতে বড়মামা বললেন, 'তুই আমার কাছে শুবি। ফাসক্লাস তিন তলার ঘর। বড় বড় জানলা। ফুর-ফুর করে হাওয়া খেলে যাচ্ছে। দুজনে মজা করে পাশাপাশি শোবো। গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বো।' বড়মামা একটিপ নস্যি নিলেন সশব্দে। মেজমামা জানলার কাঁচ পালিশ করছিলেন। মেজমামার হল পরিষ্কার বাতিক। সব সময় কাঁধে ঝাড়ন নিয়ে ঘুরছেন। আসা-যাওয়ার পথে এটা ওটা সেটা ঝাড়ছেন। সিঁড়ির হাতল, খাটের মাথা, টেবিল, ফুলদানি। তখন পড়েছিলেন জানলার কাঁচ নিয়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শোবে শোও, তবে অপঘাতে মরলে আমাদের দোষ দিও না।' আমি অবাক হয়ে বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে

রইলুম। বড়মামা ইসারায় নিজের মাথার উপর একটা আঙুল বার কতক গোল করে ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, মেজোর মাথায় গণ্ডগোল আছে। জানলার কাঁচে বড়মামার হাত ঘোরানো মেজোমামা দেখতে পেয়েছিলেন, ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ আমার মাথার গোলমাল তো হবেই, তোমার মাথাটা খুব ঠিক আছে, তাই তো? বাড়িটা তো একটা চিড়িয়াখানা বানিয়েছো ছটা গরু, কোনোটার দুধ নেই। খাচ্ছে-দাচ্ছে, নাদা নাদা হাগছে মশার চোটে বাড়ি টেঁকা যাচ্ছে না। চার-চারটে কুকুর, ঠাকুরঘরে চুরি হয়ে গেল! দুটো কাকাতুয়া সারাদিন চেল্লাচ্ছে। কার্নিসে একঝাঁক পায়রা অনবরত মাথায় পায়খানা করছে।' বড়মামা খুব রেগে গেলেন, 'তাতে তোর কি, তোর কি অসুবিধে হয়েছে?' মেজমামার কাঁচ পরিষ্কার বন্ধ হয়ে গেল, 'আমার কি? আমার কি, তাই না তোমার লাকি সকাল বেলা কার্পেট ভিজিয়েছে। তোমার গরু লক্ষ্মী, সকালে আমার বাগানে ঢুকে সব গাছ মুড়িয়ে খেয়েছে তোমার কাকাতুয়া সকালে ডানার ঝাপটা মেরে আমার চোখের চশমা ফেলে কাঁচ ফাটিয়ে দিয়েছে।'

বড়মামা আবার একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'লাকি, লাকি পেচ্ছাপ গোলাপ জল, জানিস ও রোজ ডগ সোপ মেখে চান করে তুই তো সাত জন্মেও চান করিস না।' মেজোমামা কিছুক্ষণ বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলেন, তারপরই বিস্ফোরণ—'ওঃ, গোলাপ জল তাই না! এবার থেকে বিয়ে বাড়িতে ওটাকে নিয়ে যেও, কাজে লাগবে। ভাড়া খাটাতে পার তো, গোলাপ জল ছিটিয়ে আসবে কার্পেট তুমি পরিষ্কার করবে, আমি পারবো না।'

'আমার সময় কোথায়, জানিস আমার গর্জমান প্র্যাকটিস। বড়মামা রোরিং-এর বাঙলা করলেন গর্জমান। প্রতিজ্ঞা করেছেন যখন বাংলা বলবেন 'পিওর বাংলা', যখন ইংরেজী তখন 'খাঁটি ইংলিশ'।

'তোমার প্র্যাকটিস আমার জানা আছে, যত চড়চাপড় মেরে বৃদ্ধ লোকের কাছ থেকে টাকা বাগাও।' মেজমামা সেই সাতকড়ির চোয়াল আটকে যাবার কেসটা বললেন।

'তুই ডাক্তারির কি বুজবি। একি তোর ফিলজফি!' বড়মামা মেজোমামার দর্শন নিয়ে এম. এ. পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

'তোমার গরু যদি কাল আমার বাগানে ঢোকে, আমি খোঁয়াড়ে দিয়ে আসবো।' মেজোমামা এইবার গরু দিয়ে বড়মামাকে কাবু করার চেষ্টা করলেন।

'ঠিক আছে, খাঁটি ক্ষীরের মত দুধ হলে তোকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবো।' বড়মামা লোভ দেখালেন।

'দুধ!' মেজমামা একখানা নাটকীয় হাসি ছাড়লেন। 'কার দুধ? লক্ষ্মীর দুধ! ওর পেটে দুধ ভরে বাঁটের কাছে একটা কল ফিট করে দিলে তবে যদি দুধ পড়ে, বুঝেছো? ছ'বছরেও যে দুধ দিলে না, তার দুধ তুমিই খেও। ডুমুরের ফুল দেখেছো, সাপের পা দেখেছো, সোনার পাথর বাটি দেখেছো, কুমিরের চোখে জল দেখেছো!' মেজমামা মনে হয় উপমার বন্যা বইয়ে দিতেন, যদি না সেই সময়ে ঘরে ছোটো মাসী ঢুকতেন!

ছোটো মাসীর হাতে একটা শাড়ি। মেজাজ একেবারে সপ্তমে। 'বড়দা, এটা কি হয়েছে?' শাড়িটার একটা দিক টুকরো টুকরো। মনে হয় কেউ চিবিয়েছে। বড়মামা নস্যির ডিবেটা নাচাতে নাচাতে বললেন, 'ছিঁড়ে ফেলেছিস্?'

বারুদে যেন আগুন লাগলো, 'আমি ছিঁড়েছি! তোমার খরগোসের কীর্তি।'

'যাঃ, খরগোসে তোর শাড়ি চিবোতে যাবে কেন?' বড়মামার অবিশ্বাস।

'যাবে কেন? তোমার খরগোস কোনো কিছু আস্ত রেখেছে! স্টেনলেস স্টিলের বাসনগুলোও চেষ্ঠা করেছিল, পারেনি।' মেজমামা মনে হল বেশ খুশী। মেজমামা বললেন, 'খরগোসের পেটে সব কিছু খাবার আগে রোষ্ট করে ওগুলোকে পেটে পুরে দে' বড়মামা যেন শিউরে উঠলেন। 'কাপড় তুই যেখানে যেখানে ফেলে রাখিস কেন, কেয়ারলেসের মত?' 'যেখানে সেখানে!' মাসীমা তেড়ে এলেন, 'বাসকেটে রেখেছিলুম ছাড়া কাপড়ের সঙ্গে, সেখানে গিয়ে

ঢুকেছে শয়তানগুলো।' 'বাসকেটে কেউ কাপড় রাখে?' বড়মামা দোষটা মাসীমার ঘাড়ে চাপাতে চাইলেন। 'ছাড়া কাপড় বাসকেটেই রাখে বড়দা, চিরকাল তাই রাখা হয়।' বড়মামা হাল্কা চালে বললেন, 'আর রাখিস নি। ছাড়া কাপড় একটু উঁচুতে রাখিস।' 'কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রাখবো, কিম্বা মাথায় করে ঘুরবো এবার থেকে। মাসীমা রেগে বেরিয়ে গেলেন।

মেজমামার আবার আক্রমণ, 'তোমার খরগোস সেদিন আমার চটী জুতা খেয়েছে। বলো, চটী এবার থেকে মেঝেতে খুলে না রেখে মাথায় করে ঘুরে বেড়াস?' বড়মামা ফাইন্যালি একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'দেখ মেজো, আমার বাবার বাড়িতে আমি যা খুশী তাই করতে পারি, তোদের পছন্দ না হয়, আমার কিছু করার নেই। গরু আমার থাকবে, কুকুর আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, বেটার দ্যান মেন, পাখি আমার দাঁড়ে ঝুলবে, খরগোস আমার নেচে নেচে ঘুরবে। পৃথিবীরপশুজাতি আমার বন্ধু, আমার ফ্রেন্ড।' মেজমামা কি বলবেন একটু যেন ভেবে নিলেন, তারপর ছাড়লেন তাঁর উত্তর—'বাড়িটা তোমার একলার নয়, বুঝেছো। জয়েণ্ট ফ্যামিলিতে একটু মিলেমিশে থাকতে হয়। এরপর তুমি একটা কেঁদো বাঘ আমদানী করবে, তারপর একটা বিটকেল ভাল্লুক। একদিন বাড়ি ফিরে দেখলে আমরা সব ক'টা চলে গেছি পেটে, হাড় ক'খানা পড়ে আছে। তোমার বাঘ ভাল্লুক বসে বসে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। তখন কি হবে। বলো কি হবে!'

'ঘোড়ার ডিম হবে', বড়মামার নির্বিকার উত্তর। 'বাঘ ভাল্লুক কেউ পোষে না, কথার কথা বললেই হল, না। আসলে তোরা ভীষণ মিন মাইণ্ডেড, আত্মসুখী, তোদের কোনো ক্যারেকটার নেই।

'কি বললে? আমরা চরিত্রহীন! তোমার ভারি চরিত্র আছে না? জোচ্চোর ডাক্তার। তুমি আর কথা বোলো না। রামকৃষ্ণ কি বলে গেছেন জানো, ডাক্তার আর উকিলরা কখনো সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।' মেজমামা এক নিশ্বাসে কথা ক'টা বলে গেলেন। বলে যেন বেশ তৃপ্তি পেলেন।

বড়মামা একটিপ নস্যি বেশ সশব্দে নাকে গুঁজে বললেন.

'পশুপক্ষী নিয়েই আমি থাকবো। তোরা হলি বিষাক্ত সাপ। তারপর আমাকে বললেন, 'তুই আমার একমাত্র ভাগ্নে। তুই এইসব নোংরা আদমীদের সঙ্গে একদম থাকবি না, আমার তিনতলার ঘরে আরামে ফুরফুরে হাওয়ায় আমার পাশে ঘুমোবি, সকালে আমার সঙ্গে বেড়াবি। বিকেলে লাকির সঙ্গে খেলবি।' মেজমামা কান খাড়া করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ, ভাগ্নে তোমার একলার নয়, আমাদের সকলের, আমরা সকলেই তার ভাগ পাব। তুমি বেচারাকে তিনতলার ঘরে পুরে সারারাত ফুটবল খেলবে, তা হবে না, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আই প্রোটেন্ট।

'তোর প্রোটেন্ট?' বড়মামা হাসলেন, 'তোর মত অমানুষের হাতে একে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।'

অমানুষ বলায় মেজমামা ফিউরিয়াস। 'অমানুষ কাকে বলে জানো? পশুদের কাছাকাছি যারা থাকে তারাই অমানুষ। পশুদের নিয়ে এ বাড়িতে কে থাকে? তুমি থাকো। সুতরাং অমানুষ তুমি, আয় তাই ছেলেটা তোমার হেফাজতে যাতে চলে না যায়, আমাদের দেখতে হবে!'

এইবার বড়মামার হাসবার পালা, 'তুই দেখবি। তোকে কে দেখে তার ঠিক, নেই তুই দেখবি! তুই সারা বাড়ির ধুলো আর নোংরা ছাড়া তো কিছুই দেখতে পাস না, আগের জন্মে বোধহয় ধাঙড় ছিলিস।' মেজমামা ছাড়বার পাত্র নন, 'তোমার মত অপদার্থরা বাড়িতে থাকলে আমাদের মত পদার্থওয়ালাদের তো খাটতেই হবে। তোমার পাখি, তোমার পেয়ারের কুকুর, তোমার শুকনো গরু, তেমোর বোকা রুগীর দল চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িটাকে ডাষ্টবিন বানিয়ে যাচ্ছে। আমি আছি বলে বাস করতে পারছো, চলে গেলে বুঝবে। ঠ্যালা। Cleanliness is next to Godliness, বুঝেছে। আমি হলুম সেই God'

'God!' বড়মামার বিস্ময়। 'তুই হলি গিয়ে God, আর আমরা হলুম Demon,' বড়মামার সে কি প্রাণখোলা হাসি। 'গায়ত্রী জপ করতে জানিস? গলায় তোর পৈতে আছে? সেটাকে তো বহুকাল ধোপার বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিস। বড়মামার কথা

শেষ হবার আগেই মাসীর তাড়া খেয়ে সবচেয়ে বড় খরগোসটা, যেটাকে আমরা পালের গোদা বলি, সেটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ঘরে এসে ঢুকলো। মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে ফেদার ডাস্টার তুলে সেটাকে পেটাতে যাচ্ছিলেন। 'বড়মামা খরগোসটাকে বুকে তুলে নিয়ে বললেম, 'এই যে God। জীবে দয়া করার কথাটা বুঝি তোর শাস্ত্রে লেখা নেই! শুধু জিভে দয়াটাই বুঝেছিস, না?'

বড়মামা এক বগলে খরগোস অন্য বগলে আমাকে নিয়ে বাগানে চলে এলেন। বড়মামা জুট মিলের ডাক্তার। মিলের দুটো জোয়ান ছেলে বড়মামার চাকর কাম এডি-কং কাম কনফিডেনসিয়াল এড-ভাইসার। একজনের নাম রতন আর একজনের নাম প্রফুল্ল। রতনের মুখের ডানদিকে একটা গভীর কাটা দাগ লম্বা হয়ে ভুরুর কাছ থেকে দাড়ি অবধি নেমে এসেছে। মিল এলাকায় কে যেন ছোরা মেরেছিল বছর ছয়েক আগে। বড়মামা খুব জোর চোখটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে রতনের ভগবান বড়মামা। প্রফুল্লরও তাই। প্রফুল্লর একবার কার্ডিং মেশিনে হাত ঢুকে প্রায় ছিঁড়ে গিয়ে কনুইয়ের কাছ থেকে ঝুলে গিয়েছিল। বড়মামা খুব কায়দা করে জোড়া-তালি মেরে হাতটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

মেজমামার সখ ফুল বাগান। বড় মামার ফল বাগান। রতন আর প্রফুল্ল তার মালি। শ'খানেক নারকেল গাছ সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। কেরালার গাছ। মাথায় বেশি বড় হয় না ছোটো ঝাঁকড়া গাছ। কাঁদি কাঁদি ডাব নেমে এসেছে। রতন তারই একটায় উঠে, পাতার আড়ালে ঢুকে ছিল, পা দুটো খালি দেখা যাচ্ছিল। প্রফুল্ল ছিল বাগানে। কোদাল পেড়ে মাটি কোপাচ্ছিল। বড়মামার বাগানে আসা মানে তিনটে কুকুরও পেছন পেছন এসেছে। এর মধ্যে লাকি সবার আগে, কারণ সে হল পেয়ারের কুকুর। তার সাত খুন মাপ।

বড়মামা বললেন, 'ওই দ্যাখ, রতন তোর জন্যে ডাব পাড়ছে। এক একটা ডাবের কতটা জল জানিস, ফুল দুগেলাস, আর ইয়া পুরু নারকেল। তোর মেজমামার ক্ষমতায় কুলোবে, পারবে তোকে কেরালার ডাব খাওয়াতে? ওই তো ওর বাগানের ছিরি, ক'টা

দোপাটি, কলা ফুলের ঝাড়! প্রফুল্ল'—বড়মামা হাঁক ছাড়লেন। প্রফুল্ল কোদাল ফেলে, মিলিটারি কায়দায় এগিয়ে এল। 'শোন, শিগগির মোল্লার হাটে চলে যা, দু'কেজি ফাসক্লাশ মাংস নিয়ে আয়, আর আনবি দই। জানিস কে এসেছে, হামারা ভাগনে।' প্রফুল্ল দৌড়োলো হুকুম তামিল করতে। বড়মামার এক মুখ হাসি। 'এখান থেকে যখন ফিরে যাবি, তোর ওজোন চার কেজি বাড়িয়ে তবে ছাড়বো। তোকে মাল্‌টি ভিটামিন খাওয়াবো, ফেরাডল খাওয়াবো, বোতলে ভরা নেবুর রস খাওয়াবো, দুধটা এবার খাওয়াতে পারবো না, গরুগুলো খুব শয়তানি করছে।' তারপর ফিস-ফিস করে বললেন, 'মজোটার নজর লেগে দুধ শুকিয়ে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, তার বদলে তোকে মোল্লার চকের দই খাওয়াবো।'

রতনের দাঁতে ছুরি, কোমরে দড়ি বাঁধা,হনুমানের লেজের মতো ঝুলে এসেছে। কাঁদি কাঁদি সবুজ ডাব দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল।

মেজমামার যে কেন ঠিক এই সময়ে বাগানে আসার দরকার পড়ে গেল, কে জানে। মেজমামার আবার সব ব্যাপারে নাক গলানো চাই। বিশেষত বড়মামার ব্যাপারে। দোপাটি গাছের চারায় বাঁশের কঞ্চির গোঁজ দিতে দিতে কাকে উদ্দেশ করে বললেন, বোঝা গেল না। 'এরা সব দেশের শত্রু, কচি কচি ডাব পেড়ে নষ্ট করছে। কেরালার কচি ডাব পেড়ে নষ্ট করছে। কেরালায় কচি ডাব পাড়া সরকার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে। ঝুনো হলে নারকেল হয়, ছোবড়া হয়। দেশের কাজে লাগে। তা না, বাবুরা ডাবের জল খাবেন। ডাবের জলে কি আছে। ঘোড়ার ডিম আছে!'

বড়মামা বেশ বড় করে একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'বুনো ফুল গাছ করেছিস, তাই নিয়ে থাক। ডাব নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমার ডাব আমি বুঝবো।'

'তোমার ডাব মানে? গাছ আমাদের সকলের। জানো, তুমি কি অনিষ্ট করছ? দেশের কত বড় ক্ষতি করছ? নারকেল শুকিয়ে 'কোপরা' হয়, সেই 'কোপরা' থেকে নারকেল তেল হয়। নারকেল তেলের কিলো জানো?'

'যা যা, তোর কোপরা আর তেলের নিকুচি করেছে। ডাবের জল খেয়ে পেট ঠাণ্ডা হয়।' বড়মামা একটা কাঁদির গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে লাগলেন। মেজমামা বললেন, 'মাথা জোড়া যার টাক, সে আর তেলের কি মর্ম বুঝবে! ছোবড়া থেকে কতরকম শিল্প হয় জানো? বিদেশে রপ্তানি করে কত টাকা রোজগার করা যায় জানো?'

'আমার জেনে দরকার নেই। আমাতে আর আমার ভাগ্নেতে মিলে গেলাস গেলাস জল খাবো, দুরমো নারকেল খাবো ফুলো ফুলো মুড়ি দিয়ে।'

মেজমামা আগাছা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'তাই নাকি? বার করছি তোমাদের ডাব খাওয়া, আমি কোর্ট থেকে ইনজাংসান দেওয়াবো।'

'ইনজাংসান! বড়মামা হৈ হৈ করে হেসে উঠলেন, পাগলের পাগলামী বাড়িতে চলে, বুঝেছিস্, কোর্টে চলে না। ঘাস ওপড়াচ্ছিস ওপড়া, অন্যের চরকায় তেল দিতে আসিস নি।'

রতনের উপর হুকুম হল, 'যা, সমস্ত ডাব তেতলায় আমার ঘরে খাটের তলায় নারকোল পাতা বিছিয়ে সাজিয়ে রেখে আয়। আর এখন থেকে বলে রাখছি, তোর মেজবাবু যদি কোন দিন বলে, রতন পেট-গরম হয়েছে রে, একটা ডাব কাটতো। সোজা বলে দিবি, বাজারে গিয়ে খেয়ে অসুন। গাছের ডাব একটাও দিবি না। আমাকে আইন দেখাতে এসেছে, কোর্ট দেখাতে এসেছে!'

ব্যাপারটা কতদূর গড়াতো কে জানে, হঠাৎ বড়মামার এক রোগী এসে গেল। একটা বাচ্চা ছেলে নাকে ন্যাপথালিনের বল ঢুকিয়ে ফেলেছে। বড়মামা প্রথমে পাত্তা দিতে চান নি। 'ন্যাপথালিন, আরে ভালই তো, আস্তে আস্তে উড়ে যাবে, ভয়ের কি আছে।' ছেলের মা নাছোড়বান্দা, 'উড়ে যেতে যেতে ছেলের এদিকে প্রাণ যায়, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।' 'হাতের কাছে ওসব রাখো কেন! 'বড়মামার ধমক। 'উপায় কি না রেখে। আমাদের যে ন্যাপথালিনের কারবার! সারা বাড়িতেই ছড়ানো।' বড়মামা বললেন, 'তাহলে বাড়িতে তো সব সময় একজন ডাক্তার রাখা উচিত, যেই বের করে

ি দয়ে আসবো পেছন ফিরতে না ফিরতেই তো আবার ঢোকাবে।'
ছে ে র মা করুণ গলায় বললেন, 'আর একবার ঢুকিয়েছিল, নাকে চিমটে ঢুকিয়ে বের করে দিয়েছিলুম, এবার আর বেরোচ্ছে না, আপনি একটু দয়া করুন, ছেলেটাকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, বড় হলে তারপর আনবো।'

পাড়ার কল্-এ বড়মামা সিল্কের লুঙ্গির উপর একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি পরেই বেরিয়ে পড়েন। রতন পাঞ্জাবি আর ডাক্তারী ব্যাগটা নামিয়ে আনলো। বাড়িরই সাইকেল রিক্শা রেডি ছিল। রহমতুল্লা চালায়। বড়মামা কল্-এ বেরিয়ে গেলেন। বাগানে আমি একা। লাকিটা তখন শুঁকে শুঁকে আমাকে টেস্ট করছে, আমার স্বভাব কি রকম। শুনেছি কুকুররা নাকি শুঁকেই বলে দিতে পারে মানুষটা চোর না সাধু।

মেজমামার আবার কুকুর দু'চক্ষের বিষ। নিজের ফুল বাগান থেকে হেঁকে বললেন, 'এদিকে আয়। এক া আসবি, ওই শয়তানটাকে আনবি না।' কুকুর যদি সঙ্গে সঙ্গে আসে, আমার কি দোষ! মেজমামা এক দাবড়ানি দিলেন, 'তোকেও এবার কুকুরে পেয়েছে!' 'আমি কি করবো? পেছনে পেছনে আসছে যে!' 'ঠিক আছে, তুই ওইখান থেকেই শোনা. তুই কার দলে?'

কি উত্তর দেব, বল. ুম, 'নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্রও বলতে পারেন।'

'নিরপেক্ষ তো বড়র পেছন পেছন ঘুরছিস কেন?' একটু ভেবে বললুম, 'ঘোরাচ্ছেন তাই ঘুরছি।' মেজমামা ব লেন, 'ঘুরবি না, চুপ করে করে বসে থাকবি ঘরে, তুই আমাদের কমন ভাগ্নে।' এমন জানলে কে আসতো মামার বাড়িতে! দরকার নেই বাবা, মামার বাড়ির আদরে। আমি যে এখন কোন্ দলে যাই! মাসীর কাছে যে ভিড়বো, ারও উপায় নেই। তিনি তো সারাদিন রবীন্দ্র সংগীত আর নাচ নিয়েই ব্যস্ত। আর মাঝে মাঝে সময় পেলেই খরগোসে লাথি। লাথি মারার মত খরগোসের অভাব বড়মামা রাখেন নি।

সকালের খাওয়া যেমন গুরুপাক হল, রাতের খাওয়াও কিছু কমতি—হল না। দুপুরে আবার গোটা দুই ডাবের জল! সব

মিলিয়ে টইটম্বুর ভরানদীর মত অবস্থা। রাতের খাবার পর একটা বিশাল দাঁড়ানো টেব্‌ল ল্যামপ্‌ জেবলে মেজমামা মোটা দর্শনের বইয়ে ডুবে গেলেন। সংসারে তখন কে কার। দুবার পাশে ঘুরঘুর করলুম, মনে হল মেজমামা যেন চেনেনই না। দিশি কাপড়ের কোঁচার খুঁট কার্পেটে লুটাচ্ছে। বড়মামার সবচেয়ে বড় খরগোসটা সোফার তলায় শরীর ঢুকিয়ে কোঁচার খুঁট চিবোচ্ছে। মেজমামাকে বললুম। গ্রাহ্যই করলেন না। শেষে বললেন, যা বললেন, তার মানেও বুঝলুম না। সংসারে কিছুই চিরকাল থাকে না। শরীরটাই যখন চলে যাবে তখন তুচ্ছ কোঁচার খুঁট। আবার সকালেই চায়ের টেবিলে মেজমার অন্য রূপ দেখবো। কাঁধে ঝাড়ন। এটা ঝাড়ছেন ওটা ঝাড়ছেন। তখন এই চিবোনো কাপড় নিয়ে বড়মামার সঙ্গে ধুম লেগে যাবে। মাসীকে হুকুম হবে, আজই খরগোসের রোষ্ট বানাও।

রাত ১১টা নাগাদ বড়মামা বললেন, 'চল এবার শোয়া যাক। আমি একটা সোফার উপর ঘুমিয়েই পড়েছিলুম। ধড়মড় করে উঠে বসলুম। ঘুম চোখেই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তিনতলায় উঠে এলুম। পিছন পিছন লাকি। বড়মামার হাতে পাঁচ শেলের একটা টর্চ। বড়মামার ঘরটা বেশ বড়ই। বিশাল একটা খাট। খাটের তলায় ডাবের গোডাউন। চারিদিকে বড় বড় জানালা। দুটো জানালা ছাদের দিকে। সাদা ছাদ চাঁদের আলোয় ফুটফুট করছে। পিন পড়লে খুঁজে নেওয়া যায়।

ছাদের দিকের জানালা দুটো বন্ধ করে দিলেন। 'বন্ধ করছেন?'

'তোর তো আবার সর্দির ধাত।' বড়মামার উত্তরে অবাক হয়ে গেলুম। 'কে বললে আমার সর্দির ধাত!' বড়মামা বললেন, 'আমি জানি। জানিস আমি ডাক্তার।' 'তা জানি, কিন্তু আমার সর্দিকাশি বহু বছর হয়নি। আমি একটু প্রতিবাদ করে ফেললুম! বড়মামা বললেন, দেখি তোর নখ।' অবাক হয়ে হাতের দশটা আঙ্গুল টর্চের আলোর তলায় মেলে ধরলুম। 'এই দেখ', বড়মামা দেখালেন, 'দেখছিস নখের উপর সাদা ফুল। ক্যালসিয়ামের অভাব। সর্দি তোর হবেই, হতে বাধ্য। দাঁড়া, আমার গরুর দুধ হোক। দুধ

খাইয়ে তোর সর্দি সারিয়ে দেবো।'

বিছানার উপর কেমন চাঁদের আলো লুটিরে পড়ছিল। জানলা বন্ধ করে বড়মামা চাঁদের আলো আসার পথ বন্ধ করে দিলেন। 'কেমন চাঁদের আলো আসছিল সমুদ্রের জলের মত', আমি খুঁত খুঁত করে উঠলুম। 'চাঁদের আলো!' বড়মামা চমকে উঠলেন. 'চাঁদের আলো গায়ে লাগলে কি হয় জানিস!' কি হয় কে জানে! বড়মামার ব্যাখ্যা, 'চাঁদের আলো বেশি গায়ে লাগলে চর্মরোগ হয়।' তর্ক না করে শুয়ে পড়লুম। পাতলা মশারি নেমে এল। দুটো বালিশের মাঝখানে টর্চলাইট। লাকি চলে গেল ঘরের কোণে তার নিজের জায়গায়।

বড়মামার হাই উঠলো। 'ঘুমোলি নাকি?' 'না।' 'ভূতের ভয় আছে?' গা-টা একটু ছম-ছম করে উঠলো। 'ভয় নেই, আমি আছি, টর্চ আছে।' 'ভূত আছে নাকি?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞস করলুম। 'থাকতে পারে, তাই তো ছাদের দিকে জানলা দুটো বন্ধ করে দিলুম।' বড়মামার আর একটা হাই উঠলো। 'আজ তুই পাশে আছিস, ভূত এলে দুজন লড়বো। অন্যদিন একলা থাকি তো, একটু ভয় ভয় করে। স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আজ আর খাইনি।'

বড়মামার কথায় ঘুম চমকে গেল। টর্চটা একবার হাত দিয়ে দেখে নিলুম। ভূত তাড়াবার দাওয়াই। আমার ঘুম আসার আগেই, বড় মামার নাক ডাকা শুরু হয়ে গেল। বেশ মিঠে ডাক। ফুড়ুত, ফুড়ুত, ফুড়্ ফুড়্, ফুড়ুত। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম নিজেই জানি না। হঠাৎ কোঁক করে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বুকের উপর দুম করে এটা কি পড়ল! ভয়ে ভয়ে হাত দিলুম। বড় বড় লোম। কি এটা। ভয়ে প্রায় আধ-মরা হয়ে যাবার জোগাড়। শেষে আবিষ্কার করলুম, বড়মামার হাত। হাতটাই দমাস করে বুকে পড়েছে। হাতটা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিলুম। একবার ঘুম ভেঙে গেলে ঘুম কি আর আসতে চায়! ছাদে যেন একটা খড় খড় আওয়াজ হল। ক'টা বাজাল কে জানে! চোখ চেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। হঠাৎ বড়মামার হাতটা উপরে উঠলো, এইবার পড়ছে,

পড়ছে, উরে বাবা, আমার বুকের দিকে নেমে আসছে, তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে খাটের সীমানায় সরে গেলুম। হাতটা দুম্ করে পাশে পড়ল। এক চুলের জন্য বেঁচে গেলুম। এরপরই দুম্ করে বড়মামা একটা পা ছুঁড়লেন। নেহাৎ সীমানার বাইরে ছিলুম। তা না হলে ফুটবল হয়ে যেতুম।

আড়ষ্ট হয়ে, সেই খাটের সীমানায়, বড়মামার হাত আর পায়ের ধাক্কা থেকে নিজেকে কোন রকমে বাঁচিয়ে, আবার কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। স্বপ্ন দেখছি, আমি যেন ছোটনাগপুরের কোনো এক প্রান্তরে অজস্র টিলার উপর শুয়ে আছি। সবটাই অসমতল, ভীষণ লাগছে। মাঝে মাঝে ছুরির ফলার মত কি যেন ঘাড়ের কাছের নরম জায়গায় খোঁচা মারছে। ঘুম ভেঙ্গে গেল। এ কি! আমি কোথায় শুয়ে আছি! মাথা উঁচু করতে গেলুম। উঃ! মাথা ঠুকে গেল। ঘরের ছাদটা মাথার এত কাছে নেমে এল কি করে। অন্ধকারে চোখ সয়ে এলো। আমি পড়ে আছি আমি খাটের তলায়। ডাবের গাদায় উপর। নারকেল পাতার খোঁচা লাগছে ঘাড়ের কাছে। বড়মামার বিশাল একটা পা মশারি ভেদ করে খাটের পাশে ঝুলছে। মানে বেশ মোক্ষম লাথিই আমাকে খাট থেকে ডাবের গাদায় ফেলে দিয়েছে।

খাটে ওঠার আর চেষ্টা করলুম না। বড় বিপজ্জনক জায়গা। বড়মামার দুটো হাত আর পা'র মহড়া নেবার মত শক্তি আমার নেই। তার চেয়ে কেরালার ডাবের উপর শুয়ে থাকাই ভাল। একটু অসমতল। তা আর কি করা যাবে। ভোর হতে আর কতই বা দেরী। বেশ আরামেই ঘুমিয়ে পড়লুম আবার। মাথার উপর খাটের ছাদে বড়মামা সারা রাত অদৃশ্য শত্রুর সংগে প্রচন্ড যুদ্ধ করে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠলেন! আমি তখন ছাদে হাওয়া খাচ্ছি।

হাড়ের নস্যির ডিবে থেকে একটিপ নস্যি নিতে নিতে হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন ঘুমোলি বল, ফাস্‌ক্লাশ।' লাকি বেঁড়ে লেজটা দু'বার নাচিয়ে দিল।